বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

www.parwana.net

মে ◆ ২০২৫



বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
৩২তম বর্ষ ■ ৫ম সংখ্যা
মে ২০২৫♦ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২♦ জিলকদ ১৪৪৬

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

নিয়মিত লেখক
আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মুখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

বিভাগীয় সম্পাদক
মুহাম্মাদ উসমান গণি

সহ-সম্পাদক
মনজুরুল করিম মহসিন
মো. মাহমুদুল হাসান
জামান আহমদ

বিজ্ঞাপন ও বিপণন ব্যবস্থাপক
এস এম মনোয়ার হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
জাহিদ রাহি

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ৩৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

শারহুল হাদীস
আল্লাহ বান্দার ডাকে সাড়া দেন ও তাকে ক্ষমা করেন/মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ০৫

সাহাবা
হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কারামত/মাওলানা মো. ছালিক আহমদ (র.) ০৭

প্রবন্ধ
গাযা, ৭ই অক্টোবর ও আলে সৌদের কারনামা/মারজান আহমদ চৌধুরী ০৯
নারী কমিশনের সুপারিশমালা : নারীবাদীদের ইউটোপিয়ান সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ/হামিদ মাশহুর ১২
সায়্যিদ আহমদ শহীদ ও দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলমানদের রাজনৈতিক পথনির্দেশ/মুহাম্মাদ সায়ীদ ১৫
জায়নবাদ ও হিন্দুত্ববাদ : কল্পিত প্রকল্পের নৃশংস বাস্তবায়ন/মুহাম্মাদ বিন নূর ১৮

সাক্ষাৎকার
কবি মাওলানা রূহুল আমীন খান-এর সাক্ষাৎকার ২০

তাসাওউফ
তাসাওউফের পরিচয় ও আউলিয়ায়ে কিরামের ফদীলত সম্পর্কে কিছু হাদীস/আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা ২৭

মসনবীর গল্প
ব্যাকরণবিদ ও নৌকার মাঝির বিতর্কে জীবনের রহস্য/ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ৩০

নিয়মিত
এই মাসে এই চাঁদে ৩২
জীবন জিজ্ঞাসা ৩৩
খাতুন ৩৫
বিজ্ঞান ৩৬
একনজরে গতমাস ৩৭
কবিতা ৩৯
আবাবীল ফৌজ ৪০
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।



সম্পাদকীয়

نحمده ونصلى على رسوله الكريم– اما بعد

উনবিংশ শতকে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজ যখন রাজনৈতিক শূন্যতা ও ধর্মীয় অজ্ঞতা-অপব্যাখ্যা-অবক্ষয়ে আক্রান্ত, ঠিক এমনি এক ক্রান্তিলগ্নে দিশেহারা মুসলিম মিল্লাতকে পথ দেখাতে আলোকবর্তিকা রূপে আগমন ঘটে আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ও হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর রূহানী ওয়ারিশ, আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী ও যোগ্য শিষ্য ছিলেন। ১৭৫৭ সালে পলাশীতে পরাজয়-পরবর্তী সময়ে মুসলিম সমাজ শুধু রাজনৈতিকভাবেই ভঙ্গুর হয়নি, সমাজের সর্বত্র শিরক, বিদআত ও অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে। এই সংকটময় মুহূর্তে হযরত সায়্যিদ আহমদ (র.) শিরক-বিদআত থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে মুক্ত এবং ইসলামী সংস্কার ও আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে এক অবিস্মরণীয় আন্দোলন গড়ে তোলেন। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসহ এদেশীয় বিধর্মী শত্রুদের যুলম, অন্যায় ও অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও আপসহীন সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যান। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) মুসলিমদের পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে এবং ইসলামবিদ্বেষী যালিম শাসকদের বিরুদ্ধে যে এক অভিনব আধ্যাত্মিক ও সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তা আজও বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের জন্য প্রাসঙ্গিক ও অনুসরণীয়। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) একাধারে ছিলেন মুজাদ্দিদ তথা দ্বীনের পুনরুজ্জীবনকারী, দ্বীনি-সমাজ সংস্কারক ও যালিম শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে মুসলিম প্রতিরোধ প্রচেষ্টার মর্দে মুজাহিদ। তিনি সে সময় কুরআন-সুন্নাহের দাওয়াতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজ থেকে বিদআত-শিরকের মূলোৎপাটন করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার-প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম সমাজে মদ্যপানের প্রসারসহ বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে কুসংস্কার ও ধর্মীয় রীতিনীতিতে হিন্দু সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তির মতো নানান সামাজিক ব্যাধির উদ্ভব হলে তিনি সেগুলোর সংস্কার সাধন করেন। এছাড়া ভারতবর্ষে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও খিলাফতী রাষ্ট্র কায়িমের লক্ষ্যে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের দোসর স্থানীয় যালিম শাসকদের বিরুদ্ধে বারবার সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। ১৮৩১ সালের ৬ মে ঐতিহাসিক বালাকোট প্রান্তরে শিখ ও ইংরেজ যৌথবাহিনীর বিরুদ্ধে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) যে সশস্ত্র জিহাদ-সংগ্রাম শুরু করেন, সেটি ছিল ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রথম সুসংগঠিত প্রতিরোধ। ঐতিহাসিক বালাকোট প্রান্তরের এই যুদ্ধে হযরত সায়্যিদ আহমদ (র.) শাহাদাতবরণ করলেও, তাঁর আপসহীন আন্দোলন এবং ভারতবর্ষে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি করার স্বপ্ন ও লক্ষ্য এখনো প্রাসঙ্গিক ও প্রেরণামূলক।

...

২৬ শে এপ্রিল ঢাকায় স্বাধীন ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানিয়ে আয়োজিত আধিপত্যবাদবিরোধী অনুষ্ঠানের পক্ষে প্রচারণা ও অংশগ্রহণ করায় কতিপয় ধর্মীয়-রাজনৈতিক ভিন্ন মতাদর্শী ও বিশৃঙ্খল লোক অপ্রমাণিত অভিযোগে গাজীপুরের এক মসজিদের ইমাম মাওলানা রইস উদ্দিনকে নৃশংসভাবে নির্যাতন করে। পরবর্তীতে মব সৃষ্টিকারী ঐ লোকদের অভিযোগের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়াই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করলেও, মারত্মকভাবে আহত মাওলানা রইসকে কোনো খাবার, ওষুধ, এমনকি পানিও দেওয়া হয়নি। এছাড়া মাওলানা রইসের হৃদয়বিদারক মৃত্যুর পরও তার খুনীদের গ্রেফতার বা তাদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। স্বৈরাচার সরকারের পতনের পর দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হওয়ার পরিবর্তে 'মব ভায়োলেন্স'র উল্লম্ফনের পাশাপাশি ধর্মীয় মতাদর্শগত আধিপত্যবাদ কায়িমের প্রাচীন নোংরা ধারার দুঃখজনক পুনরাবৃত্তি ও খারিজীবাদের উত্থান পরিলক্ষিত হচ্ছে। গাজীপুরে মসজিদের ইমাম রইস উদ্দিনের হত্যাকাণ্ড এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। এভাবে ধর্মীয় মতপার্থক্যের জেরে মিথ্যা অজুহাতে মব তৈরি করে হত্যাকাণ্ড, আইনের লোকদের থেকে সহযোগিতার বদলে উলটো পুলিশি হিফাযতে বিনা চিকিৎসা ও অবহেলায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া, প্রকৃত খুনীদের পরিচয়-প্রমাণ জানা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া- এসবই রাষ্ট্রের দায়িত্বহীনতা ও বিচারহীনতার সংস্কৃতির স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এবং ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদাবোধের প্রতি এক গভীর আঘাত। মব সৃষ্টিকারী, নির্যাতনকারী ও খুনীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনা হোক, দৃষ্টান্তমূলক বিচার-শাস্তির আওতায় আনা হোক দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদেরও।

আত্ তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ– كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ– فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ– فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ–

অনুবাদঃ হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে। যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো। তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তবে ন্যায়ানুগ প্রথা অনুযায়ী তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের জন্য ওসীয়ত করার বিধান তোমাদেরকে দেওয়া হলো। এটা মুত্তাকীদের জন্য একটি কর্তব্য। এটি শ্রবণ করার পর যদি কেউ এর পরিবর্তন সাধন করে তবে যারা পরিবর্তন করবে এ অপরাধ তাদেরই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। তবে যদি কেউ ওসিয়তকারীর পক্ষপাতিত্ব কিংবা অন্যায়ের আশঙ্কা করে, অতঃপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোনো অপরাধ নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা, আয়াতঃ ১৭৯-১৮২)

তাফসীরঃ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে জ্ঞানীগণ! তোমাদের উপর যা ফরয করা হলো এবং ওয়াজিব করা হলো, একজনের বদলে আরেকজনকে কিসাস হিসেবে হত্যা এমনকি প্রাণের বদলে প্রাণ, শরীরের মাংসের বদলে মাংস– এতে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবনের নিরাপত্তা।[১]

হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা যে কিসাসের আইনের ব্যবস্থা করেছেন, এর মধ্যে জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্বোধ এবং অশিক্ষিত লোকদের জন্য শাস্তি এবং নসীহতের ব্যবস্থা রয়েছে। অনেক লোক অন্যের উপর কোনো সময় আক্রমনের ইচ্ছা পোষণ করে। যদি কিসাসের নির্দেশ না থাকত, তাহলে অবশ্যই সে উদ্দিষ্ট লোককে হত্যা করত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কিসাসের বিধান দিয়ে তাদেরকে নিবৃত রেখেছেন। সত্যি বলতে কি আল্লাহ তাআলা যা কিছু নির্দেশ দিয়েছেন, সবকিছুর মধ্যে দুনিয়া এবং আখিরাতের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন, তার মধ্যে কোনো না কোনো লোকের ধর্মীয় অমঙ্গল নিহিত আছে। আল্লাহ তাআলাই জানেন তার সৃষ্টি জীবের জন্য কোথায় মঙ্গল নিহিত রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ তাআলা কিসাসের প্রচলন করে যালিম ও সীমালঙ্ঘনকারীদের হত্যা থেকে বিরত থাকার ব্যবস্থা করেছেন।[২]

হে জ্ঞানীগণ! তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে জীবন বিদ্যমান রয়েছে। যাতে করে এর দ্বারা তোমরা হত্যা থেকে বিরত থাকবে। অর্থাৎ কিসাস হচ্ছে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার একটি কারণ। কিসাসের মাধ্যমে হত্যা করলে অন্য কারো মাঝে যুদ্ধের সন্দেহ থাকবে না অথবা মানুষের মনে যখন কিসাসের কথা উদয় হবে, তখন সে হত্যা করা থেকে দূরে থাকবে। সেই সময় কিসাসই তার জীবন রক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে হযরত ইবন যায়িদ (রা.)ও বলেন।[৩]

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

পিতা-মাতা এবং যে সকল আত্মীয়-স্বজন ওয়ারিস হতে পারেন, তাদের জন্য ওসীয়ত করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার অনুমতি রয়েছে। তবে তা এক তৃতীয়াংশের বেশি করা যাবে না এবং ওয়ারিসদের উপর যুলম করার ইচ্ছা থাকতে পারবে না। এটা মুত্তাকীদের জন্য ওয়াজিব। এ নিয়ম বাস্তবায়ন করে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করা প্রয়োজন।[৪]

হযরত কাতাদাহ (র). হতে বর্ণিত, তিনি كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এ ওসীয়তের কথা আগে বলা হয়েছিল। কিন্তু পরে এ আয়াত মানসূখ হয়ে যায়, যখন অংশ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। তবে ওসীয়ত করা যাবে ঐ ধরনের আত্মীয়-স্বজনের জন্য, যারা ওয়ারিস হতে পারে না। এখন ওয়ারিসের জন্য ওসীয়ত জায়িয নেই।[৫]

হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উল্লিখিত আয়াতে মাতা-পিতার কথা মানসূখ হয়ে গেছে এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা ওয়ারিস হতে পারবে না, তাদের জন্য ওসীয়ত করার অনুমতি রয়েছে।[৬]

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, যারা ওয়ারিস, তাদের জন্য ওসীয়ত করার অনুমতি মানসূখ হয়ে গেছে এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা ওয়ারিস হতে পারবে না, তাদের জন্য ওসীয়ত বিদ্যমান রয়েছে।[৭]

হযরত আহমদ ইবন তাউস (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ওসীয়তের প্রথা তখনই ছিল, যখন মাতা-পিতা এবং আত্মীয়ের অংশ নির্ধারিত ছিল না। যখন মীরাসের আয়াত নাযিল হলো, তখন যারা ওয়ারিস হতে পারে, তাদের জন্য ওসীয়ত করা মানসূখ হলো এবং যারা ওয়ারিস হতে পারে না, তাদের জন্য ওসীয়তের অনুমতি বাকি রইল। অতএব যে নিকটাত্মীয়ের জন্য ওসীয়ত করবে, তার ওসীয়ত জায়িয হবে না। হযরত হাসান (রা.) ও অনুরূপ বর্ণনা করেন।[৮]

হযরত রবি উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে বলেন, এ প্রথা ছিল সূরা নিসা অবতীর্ণ হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত। কিন্তু যখন পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের অংশ সম্বলিত আয়াত নাযিল হল, তখন ওসীয়তের আয়াত বাতিল হয়ে যায়। শুধু অনুমতি বিদ্যমান থাকে ঐ সকল আত্মীয়-স্বজনের জন্য যারা ওয়ারিস নয়।[৯]

কেউ কেউ বলেন, আত্মীয় নিকটবর্তী বা দূরবর্তী যেই ধরনেরই হউক না কেন, ওসীয়ত কারো জন্য ওয়াজিব নেই। যেহেতু ফারাইয এর বিধান চালু হয়েছে।[১০]

হযরত ইবন যায়িদ (রা.)ও বলেন, ওসীয়ত প্রথা সম্পূর্ণভাবে মানসূখ হয়ে গেছে। বরং ফারাইযকেই ফরয করা হয়েছে।

তাছাড়া হযরত ইবন সিরীন, ইবন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন বদর, ইবন উমর, ইকরামা, হাসান বসরী, কাতাদাহ, মুজাহিদ এবং হযরত সুদ্দী (র.) হতেও একই ধরনের রিওয়ায়াত রয়েছে। মোটকথা, ইমামদের দৃষ্টিতে যদিও ওসীয়ত মানসূখ হয়েছে কিন্তু মীরাস হতে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এরকম আত্মীয়ের জন্য ওসীয়ত এর প্রথা বাকি আছে।[১১]

فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ওসীয়তকারীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণ যদি এ ওসীয়তের কথা শুনার পরও তা পরিবর্তন করে, সেক্ষেত্রে পাপ তাদেরই হবে, যারা ওসীয়ত পরিবর্তন করেছে।

অর্থাৎ ওসীয়তের ব্যাপারে সম্যক ধারনা লাভের পরও যে ওসীয়ত পরিবর্তন করে, তখন অবশ্যই গুনাহ তার উপর হবে, যে পরিবর্তন করেছে। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তোমার ওসীয়ত শোনেন এবং তোমার অন্তরের খবর জানেন। এ ব্যাপারে তাফসীরকারীগণ একমত।[১২]

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

যদি কেউ কোন অসুস্থ ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হয় এমতাবস্থায় যে, অসুস্থ ব্যক্তি কারো জন্য মৃত্যুকালীন ওসীয়ত করছে। ঐ ব্যক্তি আশঙ্কা করল যে, ওসীয়তকারী ভুল করছে। অথবা সে দেখল যে, ওসীয়তকারী ওসীয়তের মধ্যে অবিচারের ইচ্ছা পোষণ করছে এবং অন্যায় নির্দেশ দিচ্ছে। তা হলে উপস্থিত লোকের জন্য গুনাহ নেই যে, সে ঐ ব্যক্তির মধ্যে এবং তার ওয়ারিসদের মধ্যে সংশোধন করে দিবে। অর্থাৎ ওসীয়তের ক্ষেত্রে ইনসাফের নির্দেশ দিবে এবং আল্লাহ যতটুকুর অনুমতি দিয়েছেন বা মুবাহ রেখেছেন, ততটুকু প্রদানে অস্বীকার করলে উপস্থিত ব্যক্তি তাকে অনুরূপ করতে নিষেধ করবেন।[১৩]

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এটা তখনই যখন কোন ব্যক্তি এমন ব্যক্তির নিকট হাযির হলো, যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, তখন যদি সে কোন খাতে অতিরিক্ত খরচ করার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে বলা হবে তুমি ন্যায় বণ্টন কর আর কম দিলে বলবে, অমুককে এভাবে দাও।[১৪]

কোনো কোনো তাবীলকারী এ আয়াতের অর্থ সম্পর্কে বলেন, যে ব্যক্তি ভয় করে মৃত ব্যক্তির ওসীয়ত সম্পর্কে বা মুসলমানদের কোনো কাজ সম্পর্কে বা ওসীয়তকারী ভয় করে তার ওসীয়ত সম্পর্কে বা কোনো মৃত ব্যক্তির ওসীয়ত সম্পর্কে। সেক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক ওসীয়তকারীর ওয়ারিস এবং ওসীয়তকারীর মধ্যে সংশোধন করবে, যেন ইনসাফভিত্তিক ওসীয়ত হয়। সেক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কের কোনো গুনাহ হবে না।[১৫]

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, যখন মুরব্বীরা দেখেন যে, ওসীয়তে ত্রুটি হয়েছে এবং তাঁরা তা সংশোধন করে দেন, তবে তাদের কোনো গুনাহ বা দোষ হবে না। যখন কোনো ব্যক্তি ওসীয়ত করল এবং সে ওসীয়তে পক্ষপাতিত্ব করল তখন তাঁর অভিভাবকগণ সত্য ন্যায়ের প্রতি তাকে ফিরিয়ে দেবেন।[১৬]

অন্য রিওয়ায়াতে তিনি বলেন, কেউ কেউ আত্মীয়ের জন্য ওসীয়ত করল এবং ওসীয়তের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করল, সেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির মুরব্বী বা মুসলমানদের ইমামদের মধ্য হতে কেউ তা সংশোধন করে দিবেন, যেন আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ওসীয়ত সম্পন্ন হয়।[১৭]

হযরত ইবন তাউস (রা.) তাঁর পিতা হতে রিওয়ায়াত করেন, কোনো ব্যক্তি নিজের ছেলের বা মেয়ের সন্তানদের জন্য ওসীয়ত করতে পারবে। جَنَفًا শব্দের অর্থ ওসীয়তের মধ্যে ত্রুটি, আর إِثْمًا শব্দের অর্থ ওসীয়তের মধ্যে ইচ্ছাকৃত অন্যায়। যার ওসীয়তে দোষের সম্ভাবনা এবং ইচ্ছাকৃত অবিচারের সন্দেহ হয়, সেক্ষেত্রে ওয়ারিসদের মধ্য হতে কেউ তাকে সংশোধন করে দেবে। সংশোধনকারীর জন্য কোনো দোষ নেই। আল্লাহ তাআলা তোমাদের দোষ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের অবস্থার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন।[১৮]

---

১. তাবারী, ৩/৩৮১; ২. তাবারী, ৩/৩৮২; ৩. তাবারী, ৩/৩৮৩; ৪. তাবারী, ৩/৩৮৪; ৫. তাবারী, ৩/৩৮৭-৩৮৮; ৬. তাবারী, ৩/৩৮৮; ৭. তাবারী, ৩/৩৮৮-৩৮৯; ৮. প্রাগুক্ত; ৯. তাবারী, ৩/৩৯০; ১০. প্রাগুক্ত; ১১. তাবারী, ৩/৩৯১; ১২. তাবারী, ৩/৩৯৬; ১৩. তাবারী, ৩/৩৯৯; ১৪. তাবারী, ৩/৩৯৯-৪০০; ১৫. তাবারী, ৩/৪০০; ১৬. প্রাগুক্ত; ১৭. তাবারী, ৩/৪০২; ১৮. প্রাগুক্ত;

আল্লাহ বান্দার ডাকে সাড়া দেন ও তাকে ক্ষমা করেন

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: "يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً" . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح

অনুবাদ: হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকবে এবং আমার প্রতি আশা রাখবে ততক্ষণ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, তোমার থেকে যতই গুনাহ হোক না কেন। আর এতে আমি কোনো পরোয়া করি না।

হে আদম সন্তান! যদি তোমার গুনাহ আকাশ সমান হয়ে যায় অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী সমান ত্রুটি নিয়ে আমার কাছে আসো এবং আমার সাথে সাক্ষাৎ করো এমতাবস্থায় যে, তুমি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করোনি, তাহলে আমি সমপরিমান ক্ষমা নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবো।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান সহীহ বলেছেন।

হাদীসের মূলকথা

আলোচ্য হাদীসটি হলো হাদীসে কুদসী। এ হাদীসে প্রিয়নবী (সা.) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একটি মহামূল্যবান বাণী তুলে ধরেছেন। এ হাদীসে দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য মহান সুসংবাদ রয়েছে। হাদীসটির সারকথা হলো, বান্দা যতই গুনাহ করুক না কেন আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার ডাকে সাড়া দিবেন এবং সে যদি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

আল্লাহ বান্দাহ'র ডাকে সাড়া দেন ও তাকে ক্ষমা করেন

প্রিয়নবী (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي،

-হে আদম সন্তান! তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকবে এবং আমার প্রতি আশা রাখবে ততক্ষণ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, তোমার থেকে যতই গুনাহ হোক না কেন। আর এতে আমি কোনো পরোয়া করি না।

এ হাদীসে আছে, বান্দা যতক্ষণ আল্লাহকে ডাকবে এবং তাঁর প্রতি আশা রাখবে অর্থাৎ ডাকার সাথে সাথে তার প্রতি আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশা রাখবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এখানে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, বান্দা তার নিজের ব্যাপারে আল্লাহকে যেমন ধারণা করবে আল্লাহকে সেরূপ পাবে। সে যদি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন তাহলে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল হিসেবেই পাবে। একথাটি সরাসরি অন্য হাদীসে কুদসীতে এভাবে এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي -বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা রাখে আমি তেমনই। সে যখন আমাকে ডাকবে তখন আমাকে তার সাথেই পাবে। (মুসলিম, হাদীস নং ৬৫৮৫)

পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, বান্দা যদি তাঁকে ডাকে তবে তিনি তার ডাকে সাড়া দিবেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন, اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ -তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। (সূরা গাফির, আয়াত ৬০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

-যখন বান্দা আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে [তখন আপনি (হে মুহাম্মদ সা.) বলে দিন যে] নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে আহ্বান করে। সুতরাং তারাও আমার আহ্বানে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথ লাভ করতে পারে। (সূরা বাকারাহ, আয়াত ১৮৬)

বান্দা আল্লাহকে ডাকলে এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবাহ করলে আল্লাহ অত্যন্ত খুশি হন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا

-তোমাদের কেউ তার হারানো প্রাণী ফিরে পেলে যেমন খুশী হয়, তোমাদের তাওবার কারণে আল্লাহ এর চেয়ে বেশি খুশি হন। (মুসলিম, হাদীস নং ৬৭০১)

গুনাহের আধিক্য সত্ত্বেও ক্ষমার ক্ষেত্রে আল্লাহ কোনো পরোয়া করেন না

হাদীসে গুনাহ মাফ করার বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي، -তোমার থেকে যতই গুনাহ

হোক না কেন আমি তা ক্ষমা করে দেবো। আর এতে আমি কোনো পরোয়া করি না। অর্থাৎ বান্দা যদি আল্লাহর নিকট দৃঢ় আশা নিয়ে ক্ষমা চায় তার গুনাহ যত বেশিই হোক না কেন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। তার গুনাহের আধিক্যকে তিনি পরোয়া করবেন না। গুনাহ মাফের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অনুগ্রহ করতেও তিনি কোনো পরোয়া করবেন না। কারণ, বান্দাহর গুনাহের কারণে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হয় না আবার তার আনুগত্যে আল্লাহর কোনো ফায়দাও হয় না। আনুগত্য ও গুনাহের লাভ-ক্ষতি সবই বান্দার হয়ে থাকে।

আকাশ সমান গুনাহ হলেও আল্লাহ ক্ষমা করে দেন

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً"

-হে আদম সন্তান! যদি তোমার গুনাহ আকাশ সমান হয়ে যায় অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী সমান ত্রুটি নিয়ে আমার কাছে আসো এবং আমার সাথে সাক্ষাৎ করো এমতাবস্থায় যে, তুমি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করোনি, তাহলে আমি সমপরিমান ক্ষমা নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবো।

এখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, বান্দার গুনাহ যদি আকাশের প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে, এরপর বান্দা তাঁর নিকট ক্ষমা চায়, তবু আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ আরো বলেছেন, বান্দার গুনাহ যদি পৃথিবী সমান হয় অর্থাৎ বান্দা গুনাহ করতে করতে পৃথিবী ভরে ফেলে, এরপর সে আল্লাহর দরবারে তাঁর সাথে শরীক করা বিহীন অবস্থায় গিয়ে উপনীত হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে সমপরিমাণ ক্ষমার দানে অনুগৃহীত করবেন। অর্থাৎ গুনাহের সমান ক্ষমা সে লাভ করবে। যদি সে পৃথিবী সমান গুনাহ করে থাকে তাহলে পৃথিবী সমান ক্ষমা লাভ করবে (সুবহানাল্লাহ)। তবে এখানে একটি শর্ত এসেছে যে, বান্দাকে শিরক থেকে মুক্ত থাকতে হবে। পবিত্র কুরআন মাজীদেও আল্লাহ তাআলা এই ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

-আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্য সকল গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। (সূরা নিসা, আয়াত ৪৮)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দাহ'র প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। বান্দা যতই গুনাহ করুক না কেন, সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো তাকে শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যদি সে শিরক থেকে বেঁচে থাকে আর তার গুনাহ আকাশ সমান কিংবা পৃথিবী সমানও হয়ে যায় তবু আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এমনকি হাদীসের মর্মানুযায়ী যার গুনাহের পরিমাণ যত বেশি হবে সে আল্লাহর রহমত ও করুণা তত বেশি লাভ করবে। ইমাম বূসিরী (র.) কাসীদায়ে বুরদাহ'র একটি পংক্তিতে একথাটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন:

يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت
إن الكبائر في الغفران كاللمم
لعل رحمة ربي حين يقسمها
تأتي على حسب العصيان في القسم

-হে আমার নাফস! বড় কোনো পদস্খলন হয়ে গেলেও তুমি নিরাশ হয়ো না। আল্লাহর ক্ষমার ক্ষেত্রে বড় বড় গুনাহও ছোট গুনাহের মতোই। আশা করি, আমার রব যখন তাঁর রহমত বণ্টন করবেন তখন গুনাহের পরিমাণ হিসেবেই তা ভাগে পড়বে (অর্থাৎ গুনাহ বেশি হলে রহমতও বেশি হবে)।

তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এ সুসংবাদের উপর ভিত্তি করে আমল ছেড়ে দেওয়া কিংবা গুনাহে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ গুনাহ মাফ করা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তাই আল্লাহর দয়া ও করুণা লাভে তাঁর আনুগত্যে জীবন অতিবাহিত করতে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান রবের সীমাহীন অনুগ্রহ ও ক্ষমার দানে বিভূষিত করুন। আমীন।



হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) এর
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কারামত

মাওলানা মো. ছালিক আহমদ (র.)

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরাইরা (রা.)। তার প্রকৃত নাম, কুনিয়াত ও বংশ নিয়ে বিস্তর মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি আবদু শামস ও আবদু আমর নামে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। আর ইসলাম গ্রহণের পর আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান এ দুটি নামে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেন। হাকিম আবূ আহমদ (র.) বলেন, আমাদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ মত হলো তাঁর নাম আব্দুর রহমান ইবন সাখার। তবে তিনি আবূ হুরাইরা কুনিয়াতে এতই সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেছেন যে, তার আসল নাম যেন হারিয়ে গিয়েছে। তার এ কুনিয়াত বা ডাকনামটি রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখেছিলেন। কেননা তার একটি পোষা বিড়ালছানা ছিল যা সার্বক্ষণিক তার সাথেই থাকত। একদা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৌতুক ছলে সম্বোধন করে বলেছিলেন, ইয়া আবা হুরাইরা! অর্থাৎ হে বিড়ালছানার পিতা! তখন থেকেই তিনি আবূ হুরাইরা নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) রাসূলের দেওয়া এ নামটিকে এতই প্রিয় করে নিয়েছিলেন যে, অন্য নামে কেউ তাঁকে আহ্বান করুক তিনি তা পছন্দ করতেন না। তিনি খাইবার যুদ্ধের প্রাক্কালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উক্ত যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হয়ে অংশগ্রহণ করেন। আহলুস সুফফার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিলেন। তাই হাদীস হিফয করার দিক দিয়ে তিনি অপরাপর সকল সাহাবীকে ছাড়িয়ে যান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার নিকট থেকে বহু হাদীস শুনি কিন্তু ভুলে যাই। তিনি বললেন, তোমার চাদর প্রসারিত করো। আমি তা প্রসারিত করলাম। তিনি দু'হাত অঞ্জলি করে তাতে কিছু ঢেলে দেওয়ার মতো করে বললেন, এটা তোমার বুকের সাথে লাগিয়ে নাও। আমি তা বুকের সাথে লাগিয়ে নিলাম। এরপর আমি আর কিছুই ভুলিনি। (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি ৫৭ মতান্তরে ৫৮ বা ৫৯ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় ৭৮ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে

তাকে দাফন করা হয়।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) এর কারামত

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সাদকায়ে ফিতরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন, তখন (রাত্রে) দেখতে পেলাম জনৈক ব্যক্তি এসে অঞ্জলি ভর্তি করে মাল নিয়ে যেতে লাগল, তখন আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে বিচারের জন্য রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিয়ে যাবো। সে বলল, আমি একজন অভাবগ্রস্ত লোক, আমার পরিবার-পরিজন রয়েছে এবং আমি ভীষণ সংকটে আছি। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল বেলা হুযূরের দরবারে আসলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন আবূ হুরাইরা! গতরাত্রে তোমার বন্দি তোমার সাথে কি (আচরণ) করল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তার পরিবার-পরিজন ও কঠোর দৈন্যতার কথা বলায় আমার দয়া হয়েছে তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে মিথ্যা বলেছে এবং শীঘ্রই পুনরায় আসবে। তখন আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় বুঝতে পারলাম অবশ্যই সে পুনরায় আসবে। তাই আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। অতঃপর দেখতে পেলাম সে এসেছে এবং পূর্বের দিনের ন্যায় অঞ্জলি ভরে মালামাল নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে ফয়সালার জন্য হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যাবো। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি একজন অভাবগ্রস্ত, আমার পরিবার-পরিজন রয়েছে আমি আর আসব না। সুতরাং আমার দয়া হয়েছে তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। ভোরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আবূ হুরাইরা! তোমার বন্দির খবর কী? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আমার নিকট তার কঠোর দৈন্যতা ও পরিবার-পরিজনের কথা উল্লেখ করায় আমার দয়া হয়েছে। তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে। অচিরেই পুনরায় আসবে। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি তবে তার অপেক্ষায় থাকলাম। তখন সে এসে পূর্বের দিনের ন্যায় হাতের অঞ্জলি ভরে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমি তাকে ধরে বললাম, তোমাকে হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে ফয়সালার জন্য নিয়ে যাবো। আর এটা ছিল তিনদিনের সর্বশেষ দিন। তুমি না প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে পুনরায় আসবে না। তখন সে বলল, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন কিছু কালিমা শিক্ষা দিব যার দ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। তখন সে বলল, তা হলো তুমি বিছানায় শুবার প্রাক্কালে আয়াতুল কুরসী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করবে তাহলে রাত্রে সারাক্ষণ তোমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সুরক্ষাকারী নিযুক্ত হবেন এবং সকাল পর্যন্ত শয়তানও তোমার কাছে আসতে পারবে না। তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোরে রাসূলে পাক আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার বন্দি কি করেছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কিছু শেখাতে চায় যা আমার উপকারে আসবে। রাসূলে পাক ইরশাদ করেন, সে যা বলেছে তা সত্যই বলেছে তবে সে মিথ্যাবাদী। হুযূর জিজ্ঞেস করলেন, আবূ হুরাইরা! তিন রাত যার সাথে কথোপকথন করেছ তুমি কি তাকে চিনতে পেরেছো? আবূ হুরাইরা (রা.) বললেন, আমি উত্তর দিলাম, জি না। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে ছিল অভিশপ্ত শয়তান। (বুখারী; মিশকাত, পৃষ্ঠা ১৮৫)

উক্ত হাদীস প্রমাণ করে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) কর্তৃক পরপর তিন রাত শয়তানকে গ্রেফতার করা ছিল তাঁর সুস্পষ্ট কারামত। ◘

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ (চার রং)	৪০,০০০/-
২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ (চার রং)	৩০,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)	১৮,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)	১০,০০০/-
ভিতরের সিকি পৃষ্ঠা (সাদা কালো)	৬,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (চার রং)	২৫,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (চার রং)	১২,০০০/-
ভিতরের এক কলাম ৩" ইঞ্চি (সাদা কালো)	৩,০০০/-

বি. দ্র: একসাথে তিন মাসের জন্য ২৫%, ছয় মাসের জন্য ৩৫% ও এক বছরের জন্য ৫০% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।

যোগাযোগ

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০

ভিজিট করুন

তাসনীম তাসনীম
www.tasneembd.org

▼ কুরআন ▼ হাদীস ▼ আকীদা
▼ ইবাদত ▼ প্রবন্ধ ▼ জীবনী
▼ জিজ্ঞাসা ▼ বই



প্রবন্ধ

গাযা, ৭ই অক্টোবর ও আলে সৌদের কারনামা

মারজান আহমদ চৌধুরী

২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর দখলদার ইসরায়েলের ওপর গাযার ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের পক্ষ থেকে তুফানে আকসা নামক এক অভিযান আছড়ে পড়েছিল। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের প্রকল্প হিসেবে গড়ে ওঠা অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার পর সম্ভবত এটিই ছিল ফিলিস্তিনীদের পক্ষ থেকে নিজেদের ভূমি পুনরুদ্ধারের সবচেয়ে জোরালো প্রচেষ্টা। ফিলিস্তিনীরা প্রথমবার ইসরায়েলের ভেতরে ঢুকে নিজেদের দখলকৃত ভূমির একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়িয়ে আনতে পেরেছিল। তবে তুফানে আকসার যৌক্তিকতা নিয়ে আজও মুসলমানদের মধ্যে কারো কারো সন্দেহ রয়ে গেছে। সামর্থ্য ও বৈশ্বিক সমর্থনে ইসরায়েলের চেয়ে বহু পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও হামাস কেন আক্রমণ করতে গেল? এককথায় জবাব দিলে, হামাস স্বাধীন ফিলিস্তিন ও মাসজিদুল আকসার প্রশ্নকে আরও কয়েকটি দিন জিইয়ে রাখতে চেয়েছিল।

বলা হয়, সময় আঘাতের দাগ মুছে দেয়। ব্রিটিশদের দ্বারা অবৈধভাবে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর আরব ও মুসলিম বিশ্বে যে আঘাত লেগেছিল, মনে হচ্ছে সময় সেই আঘাতের দাগ ভালোভাবেই মুছে দিয়েছে। মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক এক হয়ে ইসরায়েলকে বর্জন করা এবং ইসরায়েলের পেছনে আমেরিকা আছে জেনেও আরব রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে ইসরায়েলকে উৎখাত করার সেই প্রচেষ্টাগুলো যেন আজ প্রাচীনযুগের গল্প। সময় সেই আঘাতের দাগ এতটাই মুছে দিয়েছে যে, গায়রতের মাথা খেয়ে আজ মুসলিম বিশ্বের বহু উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্র ইসরায়েলকে গোপনে অথবা প্রকাশ্যে মেনে নিয়েছে। কেউ কেউ আমেরিকা-ইসরায়েলের ডিনার টেবিলে পড়ে থাকা উচ্ছিষ্ট চেটে খেতেও প্রস্তুত। একে একে তুর্কি, মিশর, জর্ডান ও মৌরিতানিয়া অবৈধ রাষ্ট্রটিকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, যদিও মৌরিতানিয়া ২০১০ সালে পুনরায় সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। ২০২০ সালে তথাকথিত আব্রাহামিক চুক্তির আলোকে মরোক্কো, বাহরাইন, আরব আমিরাত ও সুদান ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক নরমালাইজ করেছে। প্রকাশ্যে স্বীকৃতি না দিলেও উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলো দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলের সাথে মধুর সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে।

তবে মুসলমানদের কাছে উপরোল্লিখিত রাষ্ট্রগুলোর আলাদা কোনো মাহাত্ম্য নেই। আমিরাত বা মরক্কো ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিলেই কী, আর না দিলেই কী? এমন তো নয় যে, ইসরায়েল ছাড়া অন্য ইস্যুতে এরা উম্মাতের খুব ফায়দা করছে। কিন্তু হারামাইন শরীফাইনের কারণে সৌদি আরবের একটি আলাদা গুরুত্ব মুসলমানদের কাছে আছে। তাই সবাই জানে, সৌদি যদি ইসরায়েলকে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিয়ে দেয়, তাহলে একদিকে অধিকার ও আদর্শের এ দীর্ঘ লড়াইয়ে মুসলমানদের লজ্জাজনক পরাজয় লেখা হয়ে যাবে, অপরদিকে ন্যায়ানুগ ভূমি নিয়ে একটি স্বাধীন, স্বীকৃত ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন মরে যাবে। এমন নয় যে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে কেউ স্বীকৃতি দেয়নি। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ১৯৩টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১৪৭টি রাষ্ট্র ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে। কিন্তু এটি কী ধরণের রাষ্ট্র হলো, যাদের নিজের ভূমিতে ইউরোপের অন্য এক জাতি এসে জবরদস্তি করে আরেকটি রাষ্ট্র বানিয়ে নিয়েছে, আর তারা নিজেদের ভূমিতে নিজেরাই ভূমিহীন হয়ে জীবন কাটাচ্ছে? এমনকি জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত ফিলিস্তিন ভূমি থেকে একটু একটু করে দখল করে প্রতিদিন ইয়াহুদী সেটলমেন্ট তৈরি করে যাচ্ছে ইসরায়েল। এমতাবস্থায় ফিলিস্তিনকে প্রকৃত অর্থে 'স্বাধীন রাষ্ট্র' বলার সুযোগ নেই। তাই গত আট দশক ধরে ফিলিস্তিনীরা নিজেদের ন্যায্য ভূমিতে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এ লড়াইয়ে আরব জাতীয়তাবাদী সেক্যুলার সংগঠন (PLO) যেমন আছে, আছে ইসলামী মূল্যবোধে দীক্ষিত হামাসও।

শুরু থেকে নিয়ে বর্তমান বাদশাহ সালমান ক্ষমতায় বসা পর্যন্ত অধিকাংশ সময়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের অবস্থান খুব পরিষ্কার ছিল বলা যায়। কিন্তু সেই নৈতিক অবস্থানে উলটো স্রোত বইল, যখন সালমানের পুত্র মুহাম্মদ বিন সালমান (পশ্চিমা বিশ্বে MBS নামে পরিচিত) সৌদি আরবের ক্ষমতার কেন্দ্রে আরোহন করলেন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, (এমবিএস) আরব মুলুকে পশ্চিমা বিশ্বের সবচেয়ে উপযোগী প্রোডাক্ট। ক্ষমতায় বসেই এমবিএস তার পিতাকে আক্ষরিক অর্থে 'বুড়ো বাদশাহ' বানিয়ে যেভাবে সৌদি আরবকে আধুনিকায়নের নামে বি-ইসলামীকরণ করে যাচ্ছেন, তা পৃথিবীর চোখে লুকানো কিছু নয়। সৌদির তথাকথিত আধুনিকায়নে এমবিএসের স্বপ্নের প্রকল্পের নাম ভিশন-২০৩০, যার দ্বারা তিনি তার দেশে একটি 'প্রাণবন্ত সমাজ', 'সমৃদ্ধ অর্থনীতি' এবং 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী জাতি' বিনির্মাণ করতে

চান। এসব বিলাসী শব্দগুচ্ছ আমার বানানো নয়। তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আমি এই শব্দগুলো নিয়েছি। আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে Neom (নিওম) সিটির মতো অযৌক্তিক ও অসম্ভবপ্রায় প্রকল্প যেমন আছে, সাথে কিছু সামরিক প্রকল্পও আছে। রয়টার্সের ২০২৩ ও ২৪-এর দুটি রিপোর্ট অনুযায়ী, এমবিএস আমেরিকার সাথে ন্যাটো-স্টাইলের একটি সামরিক চুক্তি করতে চান, যেন কেউ সৌদিতে আক্রমণ করলে এই চুক্তির আলোকে আমেরিকা সৌদির পক্ষ হয়ে যুদ্ধে নামে। আরেকটি হচ্ছে, এমবিএস সৌদি আরবে বেসামরিক পারমাণবিক কার্যক্রম শুরু করার জন্য আমেরিকার সহায়তা চান। আমেরিকার সাথে তার এসব চুক্তির পেছনে মূল লক্ষ্য হচ্ছে সৌদিকে ইরানের সম্ভাব্য টার্গেট হওয়া থেকে রক্ষা করা। এমবিএসের এই ভয় কিছুটা যৌক্তিকও বটে। ইরান সুন্নীদের জন্য একটি পরীক্ষিত আপদ। সামান্য সুযোগ পেলে ইরান সুন্নী রাষ্ট্রগুলোতে কতটুকু বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত ঘটাতে পারে, সিরিয়া, ইরাক ও লেবাননে তারা তা করে দেখিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে ফিলিস্তিনের জন্য দরদি ইরান উম্মাহর সম্মিলিত সাফল্যের চেয়ে 'শিয়া বলয়' তৈরি করাকে সবসময়ই প্রাধান্য দিয়েছে।

এমবিএসের খায়েশ আমেরিকার কাছে খুব বেশি গুরুত্ব পাচ্ছিল না। আমেরিকা বরং একটি গড়পড়তা সামরিক চুক্তিতেই থেমে থাকতে চাইছিল। ওদিকে ইসরায়েলের সাথে এমবিএসের গোপন প্রেম চলছিল। কারণ সৌদির আধুনিকায়ন প্রকল্পে তিনি ইয়াহুদীদের বিনিয়োগ চান। এ অবস্থায় আমেরিকার জন্য সুযোগ আসলো নিরাপত্তা চুক্তি ও ভিশন-২০৩০ প্রকল্পে আমেরিকার বিনিয়োগের টোপ দেখিয়ে ইসরায়েলের সাথে সৌদির সম্পর্ক নরমালাইজ করার। শুরু হলো সৌদি-ইসরায়েল নরমালাইজেশন প্রক্রিয়া। এমবিএস যে বাধ্য হয়ে এটি করছিলেন তা নয়। তিনি আগে থেকেই এ স্বপ্ন বুনছিলেন। নরমালাইজেশন প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতা করার জন্য ডোনাল্ট ট্রাম্পের ইয়াহুদী জামাই জ্যারেড কুশনার নিয়মিত রিয়াদে আসা-যাওয়া শুরু করলেন। ট্রাম্পের পর বাইডেনের কাছেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। ২০২২ ও ২৩ সালে কয়েকটি ইয়াহুদী ডেলিগেশন সৌদি সফর করল। বুঝতে বাকি রইল না যে, হারামাইনের খাদিম দাবি করা সৌদ খান্দান উম্মাহর জঘন্যতম দুষমনকে স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে। The Times of Israel-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২২ সালে সৌদি সরকারের আমন্ত্রণে ইসরায়েলী ব্যবসায়ী আভি জোরিশের নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি ইয়াহুদী প্রতিনিধিদল ইসরায়েলের বার্তা নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় গিয়েছিল। ফিরে এসে একজন বলেছিল, "It felt like we were engineering history." Middle East Monitor-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ইয়াহুদী ব্যাংকার রিক সোফেরের নেতৃত্বে আরেকদল ইয়াহুদী মদীনা মুনাওয়ারায় গিয়েছিল। সৌদি-ইসরায়েল বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ তারা মদীনায় একটি খেজুর গাছ রোপণ করে বলেছিল, "১৪শ বছর আগে ইয়াহুদীরা এখানে শেষবার খেজুর গাছ রোপণ করেছিল। আজ আমরা একই কাজ আবার করলাম।" প্রসঙ্গত বলে রাখি, ইয়াহুদীরা 'গ্রেটার ইসরায়েল' প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন নিয়ে এগুচ্ছে, তাতে মদীনাকেও তারা ইসরায়েলের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়।

প্রসঙ্গত এও বলে দেই, রাসূলুল্লাহ ﷺ জাযীরাতুল আরব থেকে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বিতাড়িত করার ইচ্ছাপোষণ করেছেন। এই ভূমি শুধু ইসলামের জন্য নির্ধারিত (সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৭৬৭)। আর ওরা ইয়াহুদীদেরকে মদীনা মুনাওয়ারাতে ডেকে এনেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জাযীরাতুল আরব থেকে মুশরিকদের বের করার নির্দেশ দিয়েছেন (সহীহ বুখারী, হাদীস-৪৪৩১)। ওরা আবুধাবিতে মন্দির বানিয়ে আরবের যমীনে মূর্তিপূজা ফিরিয়ে এনেছে। আমিরাত, ওমান ও বাহরাইনে আগে থেকেই কিছু ছোট মন্দির ছিল, যেহেতু ওসব দেশে প্রচুর হিন্দু বাস করে। তবে ২০২৪ সালে ২৭ একর জায়গাজুড়ে আবুধাবিতে যে বিশাল মন্দির বানানো হয়েছে এবং হিন্দুত্ববাদের শিরোমণি নরেন্দ্র মোদিকে ডেকে এনে যে জাঁকজমকপূর্ণভাবে তা উদ্বোধন করা হয়েছে, তাতে বিশ্বাস হয় না ওই ভূমিতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য সাহাবায়ে কিরাম একদা ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন । আরবদের 'আধুনিকায়ন' এখানেই শেষ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যেসব জায়গায় পূর্ববর্তী জাতির ওপর আল্লাহর আযাব এসেছে, ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতীত সেসব জায়গায় যেও না। হয়তো একই আযাব তোমাদের ওপরও আসতে পারে (সহীহ বুখারী, হাদীস-৪৩৩)। এরকম একটি জায়গা হচ্ছে হিজর, যা সৌদি আরবের আল-উলা শহরে অবস্থিত। সেখানে নবী সালিহ (আ.) এর কউমের ওপর আল্লাহর ভয়াবহ আযাব এসেছিল। তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসূল ﷺ নিজের শির মুবারক চাদর দিয়ে ঢেকে ইস্তিগফার পড়তে পড়তে দ্রুত ওই জায়গা অতিক্রম করেছেন । সাহাবীদেরকে এক মুহূর্ত সেই এলাকায় থাকতে দেননি। সৌদির আধুনিকায়নের আলোকে আল-উলা এখন ট্যুরিস্ট স্পট। থিম পার্ক বানিয়ে আল-উলায় প্রতিনিয়ত উদোম কনসার্ট করা হচ্ছে। এ যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ফরমানের সাথে টিটকারি করা!

ফিরে যাই আগের কথায়। ইসরায়েল ভাবছিল সৌদির সাথে সম্পর্ক নরমালাইজ করা শুধু সময়ের ব্যাপার। কিন্তু এমবিএসের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ বাকি ছিল। তা হলো, অন্য কোনো মুসলিম দেশ ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক নরমালাইজ করলে কেউ খেয়ালই করবে না। কিন্তু হারামাইনের কারণে সৌদি আরব মুসলিম উম্মাহর ওপর এক ধরণের প্রচ্ছন্ন কর্তৃত্ব রাখে। এ অবস্থায় কোনো দৃশ্যমান বিনিময় ব্যতীত সৌদি যদি ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়ে দেয়, তাহলে এমবিএসের নিজের দেশেই আক্রোশের দানা বাঁধবে। রাজা-বাদশাহরা বিক্রি হয়ে গেলেও সাধারণের মধ্যে তো ফিলিস্তিনের জন্য দরদ বাকি আছে। তাই স্বাধীন ফিলিস্তিন না হোক, অন্তত আল-আকসার ব্যাপারে ইসরায়েলকে একটি সিদ্ধান্তে নিয়ে আসতে এমবিএস আমেরিকার কাছে আকুতি করেন। যেন তিনি দেখাতে পারেন, ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়ার বদলে তিনি কিছু একটা নিয়ে এসেছেন। ট্রাম্প-বাইডেন উভয়েই নেতানিয়াহুকে বুঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাকে রাযি করাতে পারেননি। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু স্বাধীন ফিলিস্তিন বা আল-আকসার প্রশ্নে কোনো কথা বলতেও রাজি নয়। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বক্তৃতায় নেতানিয়াহু ভবিষ্যত মধ্যপ্রাচ্যের একটি মানচিত্র প্রদর্শন করে। সেই মানচিত্রে ফিলিস্তিনের চিহ্নটিও ছিল না। অর্থাৎ ইসরায়েলের পরিকল্পনা হচ্ছে, মুসলমানদেরকে যেভাবেই হোক বিদায় করে ফিলিস্তিনের পুরো ভূমি দখল করা। ওদিকে এমবিএস নেতানিয়াহুর এই ঔদ্ধত্যের পরও সম্পর্ক নরমালাইজ করতে পিছপা হচ্ছিলেন না। ঠিক এ সময়, ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর অবরুদ্ধ গাযা থেকে হামাসের মুক্তিযোদ্ধারা ইসরায়েলে অভিযান পরিচালনা করে। তাৎক্ষণিক এর দুটি ফলাফল দেখা যায়। প্রথমত, ইসরায়েল বহু আগেই গাযাকে মুসলিম-মুক্ত করার পরিকল্পনা করছিল, তবে সময় ও প্রস্তুতি নিয়ে। কিন্তু হামাসের অভিযানের জবাব দিতে গিয়ে রাজনৈতিক ও কূটনীতিকভাবে

অনেকটা অপ্রস্তুত অবস্থায়ই নেতানিয়াহুকে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নামতে হয়। দ্বিতীয়ত, গাযায় ইসরায়েলের হামলা শুরু হলে ১৪ অক্টোবর সৌদি-ইসরায়েল নরমালাইজেশন প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায়। তবে স্থগিত হলেও সেটি বাতিল হয়নি। গাযায় আগ্রাসন শুরুর পর বাইডেন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন সৌদি সফর করে এমবিএসকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন আরবের সাধারণ মানুষকে শান্ত রাখেন। এমবিএস তার তুরুপের তাস শাইখ আব্দুর রহমান আস-সুদাইসকে কাজে লাগান। Middle East Eye-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, সুদাইস ফাতওয়া দেন, গাযা হচ্ছে একটি ফিতনা। এই ফিতনা যেন মুসলমানদেরকে উলুল আমরের (এমবিএস) আনুগত্য থেকে দূর না করে। গাযার ব্যাপারে সৌদির অবস্থান বুঝার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, যেদিন গাযায় ইসরায়েলের সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান হামলা চলছিল, সেই ২৮ অক্টোবর রিয়াদের একটি কনসার্টে উদ্দাম নেচে যাচ্ছিল পশ্চিমা এক নারী পপস্টার। প্রথমদিকে হারামাইনে গাযার জন্য দুআ করাও নিষিদ্ধ ছিল। পরে দুআ করার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে সেটি মূলত আকসার জন্য। হারামাইনের ইমামরা গাযার নামটি পর্যন্ত মুখে নেন না। এই হচ্ছে ৭ই অক্টোবরের আগে ও পরে আলে সৌদ, বিশেষত এমবিএসের কারনামা। প্রশ্ন আসে, এই পুরো দৃশ্যকল্পে হামাসের কৃতিত্ব বা তুফানে আকসা অভিযানের যৌক্তিকতা কী? বেশ কয়টি জবাব আছে। প্রথমত, এর দ্বারা সৌদি-ইসরায়েল নরমালাইজেশন আপাতত স্থগিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ইসরায়েল এর আগেও গাযায় আগ্রাসন চালিয়েছে। তবে এবারের গণহত্যার প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী ফিলিস্তিনের পক্ষে যে জনমত গড়ে উঠেছে, তা এর আগে হয়নি। কে ভাবতে পেরেছিল, ইউরোপ-আমেরিকার শহরে-বন্দরে লাখ-লাখ মানুষ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নেমে আসবে? গাযা আগ্রাসন চলাকালে গত দু'বছরে স্পেন, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে, মেক্সিকোসহ ১০টি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ফ্রান্স চলতি বছর স্বীকৃতি দেবে বলে জানিয়েছে। জাতিসংঘে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এতো বেশি রেজুলেশন উত্থাপিত হয়েছে যে, আমেরিকা ভেটো না দিলে এতদিনে ইসরায়েল একঘরে হয়ে যেত। International Court of Justice ইসরায়েলের দখলদারিমূলক কর্মকাণ্ডকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। বর্তমানে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যা মামলা চলছে। দুঃখের বিষয় হলো, কোনো আরব রাষ্ট্র ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা করেনি। করেছে বহুদূরের দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা। হয়তো এসবের তেমন কোনো প্রভাব ইসরায়েলের ওপর পড়বে না। তবে অন্যায়ে ভরা এই বিশ্ব-বাস্তবতায় এটুকুও উল্লেখযোগ্য।

বাইডেন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন সৌদি সফর করে এমবিএসকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন আরবের সাধারণ মানুষকে শান্ত রাখেন। এমবিএস তার তুরুপের তাস শাইখ আব্দুর রহমান আস-সুদাইসকে কাজে লাগান। Middle East Eye-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, সুদাইস ফাতওয়া দেন, গাযা হচ্ছে একটি ফিতনা। এই ফিতনা যেন মুসলমানদেরকে উলুল আমরের (এমবিএস) আনুগত্য থেকে দূর না করে।

তৃতীয়ত, এবারের আগ্রাসনে মুসলিম বিশ্বে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে, তাতে অন্তত বুঝা যায় ফিলিস্তিন ও আল-আকসার প্রশ্নটি বিভক্ত এই উম্মাহকে আজও এক করার ক্ষমতা রাখে। ওরা ফিলিস্তিন ও আকসার প্রশ্নকে মুছে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ফিলিস্তিন ও আকসা আমাদের প্রজন্ম পার করে পরের প্রজন্মের হৃদয়েও স্থান করে নিয়েছে। যে শিশু-কিশোররা আজ গাযার দৃশ্যগুলো দেখছে, তারা জীবনভর এটি ভুলবে না। পথ দেখালে এই শোক একদিন বিপুল শক্তিতে পরিণত হবে। এই সবকিছুর কৃতিত্ব ওই হামাস যোদ্ধাদের, যারা প্রাণের ওপর ঈমান ও ইযযতকে স্থান দিয়েছে। যারা বলেন, হামাস যুদ্ধে যাওয়ার আগে মুসলিম বিশ্বের অনুমতি নেয়নি, তারা এসি রুম, লম্বা বেতন, পডকাস্টের মাইক্রোফোন ও নিরাপদ মিম্বার ছেড়ে একদিনের জন্য গাযায় বাস করে দেখান। দীর্ঘ ১৬টি বছর ধরে অবরুদ্ধ, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় খোলা জেলখানা এই গাযা। জীবনের নিরাপত্তা নেই, নেই নাগরিক সুবিধা। সেই আবদ্ধ ভূমিতে গড়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য দেশে-দেশে ঘুরে অনুমতি নেবে? চলমান গণহত্যায় গাযার ষাট হাজারের মতো মুসলমান শহীদ হয়েছেন। তবে হামাসের অভিযান না হলেও এই হত্যাকাণ্ড ঘটত, অন্য কোনো ছুতোয়। ইসরায়েল গাযাকে মুসলিম-মুক্ত করতে বহুদিন ধরে মরিয়া হয়ে আছে, আমেরিকাও তাতে রাযি। আমেরিকা মিশরকে চাপ দিচ্ছে গাযাবাসীকে গ্রহণ করার জন্য, যেভাবে জর্ডান পশ্চিমতীরের ফিলিস্তিনীদের একটি বিশাল অংশকে গ্রহণ করেছে। ইসরায়েল চাচ্ছিল সময় ও প্রস্তুতি নিয়ে গাযায় ধীরে ধীরে হামলা করতে। হামলায় কিছু মানুষ মরল, বাকিদেরকে মিশরের সিনাই উপত্যকায় ঠেলে দেওয়া গেল। যদি এরকম না করে সময় নিয়ে তা করতে পারত, তবে বিশ্বজুড়ে এতটা হাউকাউ হতো না। কিন্তু হামাস সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে। আমি গাযাবাসীর শাহাদাতকে আল্লাহ তাআলার এক মহাপরিকল্পনার অংশ মনে করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় মুসলমানদের মধ্যে তিনটি ভাগ হয়ে যাবে। একভাগ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করবে এবং তারা আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ শহীদ বলে গণ্য হবে। আরেকভাগ যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে যাবে, যাদের তাওবাকে আল্লাহ কখনও কবুল করবেন না। আরেকভাগ ইমাম মাহদীর সাথে টিকে রইবে এবং শেষপর্যন্ত বিজয়ী হয়ে ঘরে ফিরবে (সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৮৯৭)। হয়তো মাহদীর আগমণের পূর্বেই এই বাছাইপর্ব শুরু হয়ে গেছে। উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে কিছু পাক রূহকে তিনি শহীদ হিসেবে কবুল করছেন। যারা জীবিত আছে, তাদের মধ্যেও দুটি ভাগ দেখা যাচ্ছে। কেউ তার সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে আওয়াজ তুলে, কলম চালিয়ে, সাহায্য পাঠিয়ে, যালিমের পণ্য বয়কট করে মুমিনের কাতারে টিকে থাকতে চাইছে। আর যারা শুধু কূটনীতিক চেষ্টার দ্বারাই মাযলুমকে রক্ষা করতে পারত, তারা ঠুনকো দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য বোবা শয়তান হয়ে পলায়নকারীদের কাতারে শামিল হচ্ছে। অবশ্য এটি আমার নিজের চিন্তা। কিন্তু এটি তো সত্য যে, গাযা এই উম্মাহর সম্মিলিত ব্যর্থতা এবং সম্ভাব্য ঐক্যের প্রতীক হয়ে গেছে। হতে পারে, বুকভাঙা এই মুহূর্তগুলো আমাদের ভবিষ্যত গড়ে দিচ্ছে।

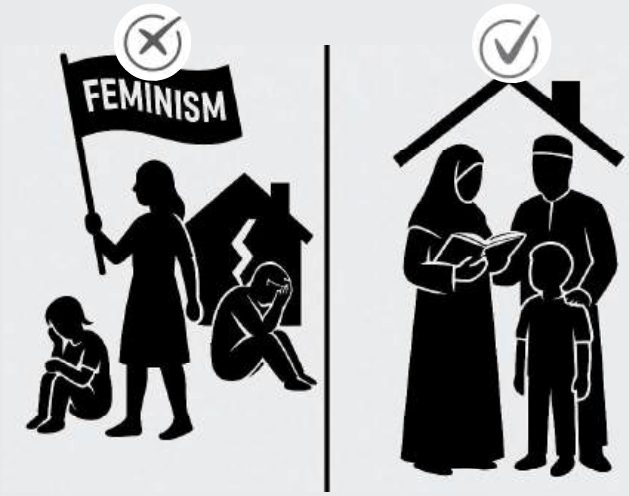

নারী কমিশনের সুপারিশমালা
নারীবাদীদের ইউটোপিয়ান সমাজব্যবস্থার স্বরূপ

হামিদ মাশহুর

নারী কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে চলমান বিতর্কে এক ধরণের গণ সচেতনতা ইতোমধ্যেই তৈরি হয়েছে। এ গণ সচেতনতা যতোটা না কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর এক্টিভিজম এর ফলে হয়েছে, তার থেকে বেশি হয়েছে নারীবাদীদের প্রতি এদেশের মানুষের সম্মিলিত অনস্থা ও অবিশ্বাসের ফলে। এই রিপোর্টের বিস্তারিত না জেনেও তাই যে কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারছে যে এটা তাদের জন্য কল্যাণকর কিছু নয়। তারপরও আসলেই এই রিপোর্টে আপত্তিকর কি আছে তা পাঠককে জানানোর অভিপ্রায়ে রিপোর্টটি এক নযর দেখার চেষ্টা করলাম। প্রাথমিকভাবে রিপোর্টটিকে নারীবাদীদের ইউটোপিয়ান সমাজব্যবস্থার দলিল হিসেবেই আমার মনে হয়েছে। আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, প্রথা এগুলাকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে কমিশন শতভাগ ফোকাস করেছে আসলে নারীবাদীরা কেমন সমাজ চায় তার উপর। রিপোর্টের শত শত সুপারিশমালার অল্প কয়েকটা পর্যালোচনা করলেই আমরা বুঝতে পারবো আসলে নারীবাদীদের কল্পিত স্বর্গরাজ্যের স্বরূপ। প্রথমেই বলে রাখি, এই কমিশনের রিপোর্টে শব্দের মারপ্যাঁচ থেকেই আপনি বুঝে যাবেন যে আদতে কমিশন চায়নি তাদের রিপোর্টের মাধ্যমে এদেশের নারীদের জন্য উপকারী সর্বজন গ্রহণযোগ্য কিছু আইন পাশ হোক। তারা বরং শব্দের মারপ্যাঁচে নারীবাদী বয়ান প্রচারেই বেশি মনোযোগী ছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- জেলা, উপজেলা, ও ইউনিয়ন পরিষদের প্রধানকে বহু যুগ ধরেই আমরা "চেয়ারম্যান" হিসেবে জানি। কিন্তু কমিশনের রিপোর্টে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রধানকে বারবার "চেয়ারপার্সন" বলা হয়েছে। এই যে প্রচলিত শব্দকে লিঙ্গ নিরপেক্ষ করার নারীবাদী বিকার এটা আদতে নতুন ভাষা তৈরি ছাড়া সম্ভব নয়। রিপোর্টে বহুবার নারী-পুরষ ছাড়াও "অন্যান্য লিঙ্গ" শব্দদ্বয় ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এটা পড়ে মনে হবে যেন পুরুষ ও নারী ছাড়াও একাধিক লিঙ্গ রয়েছে। আমরা যারা স্বাভাবিক মানুষ, আমরা জানি পুরুষ ও নারী ছাড়া আর এক শ্রেণীর মানুষই জন্ম নেন, তারা হলেন তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়া। কিন্তু এলজিবিটিকিউ (LGBTQ) প্রমোট করার উদ্দেশ্যে যে নানারকম লিঙ্গের কথা আজকাল উচ্চারিত হচ্ছে তারই প্রতিফলন রিপোর্টে নারী-পুরষ ছাড়াও "অন্যান্য লিঙ্গ" বলে তিনের অধিক লিঙ্গকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা। কমিশনের রিপোর্টে বৈবাহিক ধর্ষণ রোধে কার্যকর আইন প্রণয়ন করার সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে যে অল্প-বিস্তর জোরাজুরি কখনো কখনো হয়ে থাকে সেটাকে কাঠামোবদ্ধ আইনের মাধ্যমে অবৈধ ঘোষণা করা। এর অর্থ হলো স্ত্রীর 'কনসেন্ট' ছাড়া কোনভাবেই নিজের বিবাহিত স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ হওয়া যাবে না। এখন প্রশ্ন হলো এই কনসেন্ট কি লিখিত হবে নাকি মৌখিক হবে? মৌখিক হলে তো পরে যেকোন কারণে স্ত্রী তা অস্বীকার করতে পারেন এবং স্বামীকে কোন অসৎ উদ্দেশ্যে ফাঁসিয়েও দিতে পারেন। তাহলে আমাদের কাছে অপশন বাকি থাকলো শুধু স্ত্রীর নিকট লিখিত কনসেন্ট নিয়ে অন্তরঙ্গ হওয়া। এই যে কনসেন্ট বিষয়ক মুখরোচক আলোচনার মাধ্যমে বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে জটিলতা তৈরি করা, এটা করে নারীবাদীদের কি লাভ তা বুঝতে হলে আপনাকে জানতে হবে বহুবিবাহ নিয়ে উনাদের সুপারিশ। রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে বহুবিবাহ নিরুৎসাহিত করতে আইন করতে হবে এবং বহুবিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রীর যথাযথ অনুমতি গ্রহণ অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। সহজভাবে আমি 'কনসেন্ট' বিষয়ক সুপারিশের সাথে 'বহুবিবাহ' বিষয়ক সুপারিশকে মিলিয়ে পড়লে যেটা বুঝতে পারি, স্ত্রী যদি স্বামীর জৈবিক চাহিদা পূরণে অক্ষম হন অথবা কনসেন্ট না দেন, তারপরও স্বামীর জন্য আরেকজন স্ত্রী গ্রহণ বৈধ হবে না যতক্ষণ না তার অক্ষম স্ত্রী দয়াপরবশ হয়ে স্বামীকে আরেকটি বিয়ের কনসেন্ট দেন। আর আমরা সবাই জানি অক্ষম স্ত্রীরাও স্বামীকে পুনরায় বিয়ের অনুমতি দেওয়া কার্যত অসম্ভব, ইম্প্র্যাক্টিক্যাল। তাহলে অবস্থা দাঁড়ালো স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ হওয়ার কনসেন্ট পাওয়া গেলো না, নতুন বিয়ের কনসেন্টও পাওয়া গেলো না। তাহলে বেচারা পুরুষ লোকের হবেটা কি? হতাশ হবেন না। আমাদের নারীবাদীরা এতোটাও নিষ্ঠুর না। পুরুষদের উপকারের জন্য উনারা সুপারিশ করছেন যেন যৌনকর্মীরা শ্রমিকের মর্যাদা পান। একজন পুরুষের জন্য বিবাহিত স্ত্রীর থেকে উপকৃত হওয়ার, অথবা বহুবিবাহ করে বৈধভাবে উপকৃত হওয়ার রাস্তা কঠিন করে আমাদের নারীবাদীরা সহজ করছেন যেন পুরুষ মানুষ বৈধভাবে যৌনকর্মীদের থেকে "উপকৃত" হতে পারেন। 'কনসেন্ট' বিষয়ক আইনের মারপ্যাঁচ, বহুবিবাহ কঠিন করা এবং ডিভোর্স আইনকে কঠোর করার মাধ্যমে প্রায়োগিকভাবে যেটা হবে তা হলো পুরুষরা বিয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে

হবেন, অধিক বয়সী নারীদের বিয়ে থেকে বিরত থাকবেন এবং সকল বিয়েতেই সহজ ডিভোর্সের উপায় হিসেবে দেনমোহর কম ধার্য্য করার চেষ্টা করা হবে। সকল পুরুষই যখন কালেক্টিভলি এই কাজ করবেন তখন একটু বয়স্ক মেয়েদের বিয়ে হওয়া তো কঠিন হবেই, অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রেও প্রত্যাশিত দেনমোহর পাওয়া কঠিন হবে। আর 'কনসেন্ট' ইস্যুর বাড়াবাড়ি ডিভোর্সের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি করবে। এই পুরো ব্যবস্থায় লাভবান হবে শুধু যৌনকর্মীরা । তাদের ব্যবসার যে সম্ভাবনা এতে তৈরি হবে তার সাথে যদি যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ে নারীবাদীরা সফল হন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই প্রস্টিটিউশন একটা বিশাল সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, আর বলাই বাহুল্য এই ইন্ডাস্ট্রির কর্ণধার হবেন আমাদের নারীবাদীরা। দয়াবান নারীবাদীরা নিজেদের ইন্ডাস্ট্রির শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিতে আরেকটি সুপারিশ করেছেন- তারা দাবি করেছেন যেসব নারী তার সন্তানের পিতৃপরিচয় প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক তাদের সন্তানদের শুধু মায়ের নামেই যাবতীয় রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে, অর্থাৎ মানব সন্তানের পরিচয়ে বাবার নাম অপশনাল করতে হবে। যৌনকর্মীদের নিয়ে ইন্ডাস্ট্রি গড়তে এর থেকে ভালো সুপারিশ আর কিছু হতেই পারে না! রিপোর্টে যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতির ব্যাপারে যতোটা গুরুত্ব দিয়ে আলাপ করা হয়েছে সে তুলনায় এদেশের কোটি কোটি গৃহিণীদের সম্পর্কে রিপোর্টে তেমন কোন আলাপ নেই বললেই চলে। আমাদের অনেকেরই জানা আছে পশ্চিমের সাথে আমাদের সমাজের সবচেয়ে বড় ফারাক ওয়েস্ট বহু আগে থেকেই ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক সমাজে পদার্পণ করলেও আমাদের সমাজ এখনো কালেক্টিভিস্ট। আমাদের সমাজে এখনো একান্নবর্তী পরিবার প্রচুর পাওয়া যায়। এই সমাজে এখনো পরিবারের এক বা দুইজন সদস্য সবার জন্য রান্না করেন, গৃহস্থালির সকল কাজ করেন। আমাদের গৃহিণীদের এসব কাজের বিপুল অর্থমূল্য পশ্চিমে তো রয়েছেই, যেকোন সমাজেই রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা কোটি কোটি নারীর এই কাজের অর্থমূল্যকে যথাযথভাবে অর্থনৈতিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি, ফলে আমাদের একটা বিপুল জনগোষ্ঠীর উৎপাদনমুখী কর্মজজ্ঞ জিডিপির হিসাবের বাইরেই রয়ে গিয়েছে। এতো এতো রেডিক্যাল ফেমিনিস্ট ধারার সুপারিশের মধ্যে চাইলেই নারী কমিশন সুপারিশ করতে পারতো গৃহস্থালীর কাজের যথাযথ অর্থমূল্য জিডিপিতে হিসাব করতে হবে। তারা তা করেননি, কারণ গৃহিণী হওয়া তাদের জন্য অভিশাপ আর যৌন শ্রমিক হওয়া অপরচুনিটি।

> “
> আমাদের নারীবাদীরা নারীর প্রতি বৈষম্যমুক্ত সমাজের প্রচারণার আড়ালে যে আদতে একটি নারীতান্ত্রিক বা নারী শাসিত সমাজের স্বপ্ন দেখেন এটা বুঝা যায় তাদের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ক সুপারিশ থেকে। সেখানে তারা দাবি করছেন সংসদ হবে ৬০০ আসনের। যার অর্ধেক হবেন নারী, এবং বাকি অর্ধেক হবেন নারী-পুরুষের সমন্বয়ে, অর্থাৎ যিনি জিতবেন তিনি।
> ”

আমাদের নারীবাদীরা নারীর প্রতি বৈষম্যমুক্ত সমাজের প্রচারণার আড়ালে যে আদতে একটি নারীতান্ত্রিক বা নারী শাসিত সমাজের স্বপ্ন দেখেন এটা বুঝা যায় তাদের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ক সুপারিশ থেকে। সেখানে তারা দাবি করছেন সংসদ হবে ৬০০ আসনের। যার অর্ধেক হবেন নারী, এবং বাকি অর্ধেক হবেন নারী-পুরুষের সমন্বয়ে, অর্থাৎ যিনি জিতবেন তিনি। সহজ করে বললে তিনশত আসনে নিশ্চিতভাবেই নারীরা থাকবেন আর বাকি তিনশত আসন থেকেও পুরুষের সাথে কম্পিটিশন করে নারীরা আসতে পারবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে এর মাধ্যমে মূলত জাতীয় সংসদের মতো জায়গায় নিশ্চতভাবেই পুরুষদের মাইনোরিটি হিসেবে রাখার সুপারিশই করা হয়েছে। এদেশের একটা বিপুল সংখ্যক নারীদের যেখানে ন্যূনতম রাজনৈতিক সচেতনতা আছে কি না তাই আলোচনাসাপেক্ষ, সেখানে নারী শাসিত সংসদের সুপারিশ করা আসলে এই কমিশনের সদস্যদের মশকরা। এসব নারীবাদীরা যে নারীকে তোয়াজ করে নুইয়ে পড়তেন সে নারী ফ্যাসিস্টকে আমরা ভুলিনি। জুলাইয়ের শহীদদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে উনাদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো উনারা তা সিরিয়াসলি না নিয়ে এটাকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছেন। নারী কমিশনের সুপারিশে বারবার আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন ধর্ম ভিত্তিক পারিবারিক আইন সংশোধন করে নারী-পুরুষের সম্পদ প্রাপ্তির সমতা, ডিভোর্সের সমতা ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। ইউনিফর্ম ফ্যামিলি ল পাশ করে তা পালন করা ঐচ্ছিক হিসেবে রাখার যে সুপারিশ করা হয়েছে তা আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ মনে হলেও আসলে এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি চালাকি। আমরা সবাই জানি ধর্মীয় নৈতিকতাবোধ থেকেই বিবাহের চর্চা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ বিয়ে কোন রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে সমাজে প্রচলন হয়নি, প্রচলন হয়েছে ধর্মীয় আইন হিসেবে। বিয়ে নামক এই ধর্মীয় বন্ধনের মাধ্যমেই পরিবারের সূচনা হয়েছে। অর্থাৎ বিয়ে এবং পরিবারের বুনিয়াদই হলো ধর্ম। আধুনিক জাতি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্র সেসব ধর্মীয় বিধানকে আত্মিকরণ করে বিয়ে এবং পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে। যেসব মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী নয় তারা আসলে বিয়ে নামক এই ধর্মীয় অনুশাসন মানারই কথা না। তারপরও ধর্মে বিশ্বাসী নয় এমন লোকজনের জন্য বিশেষ বিবাহ আইন, ১৮৭২ এর মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ

হওয়ার সুযোগ আছে। সুতরাং বিবাহ এবং পারিবারিক জীবনে যারা ধর্মীয় আইন মানতে চান না, তাদের জন্য নতুন করে কোন আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতা নেই। ইউনিফর্ম ফ্যামিলি ল পাশ করার সুপারিশ যে দুরভিসন্ধিমূলক তা স্পষ্ট হয় মুসলিম পারিবারিক আইনসহ অন্যান্য ধর্মভিত্তিক পারিবারিক আইন সংশোধনের সুপারিশ থেকে। একদিকে কমিশনের সদস্যরা দাবি করছেন ইউনিফর্ম ফ্যামিলি ল ঐচ্ছিক আইন হবে, যারা চাইবে তারা এটা মানবে আর যারা চাইবে না তারা ধর্মভিত্তিক পারিবারিক আইনসমূহ মানবে। আবার ধর্মভিত্তিক পারিবারিক আইন সমূহ সংশোধন করে সেখানে নারী-পুরুষের সম্পদ প্রাপ্তির সমতা, ডিভোর্স, সন্তানের কাস্টোডি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ধর্মীয় আইনের বিপরীত সুপারিশ করা হয়েছে। এই সুপারিশসমূহ রীতিমতো ধর্ম অবমাননা হিসেবে কমিশনকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। ইউনিফর্ম ফ্যামিলি ল এর অধীনে নারীবাদীরা যেমন পরিবার চান তার প্রস্তাব তারা করতেই পারেন, কিন্তু মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের নিজেদের ধর্মভিত্তিক পারিবারিক আইনকে সংশোধন করার সুপারিশ নিঃসন্দেহে সে ধর্ম এবং ধর্মাবলম্বী মানুষকে অবমাননা। নারী কমিশনের অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি সুপারিশ হলো নারীর প্রতি বৈষম্য বিলুপের বৈশ্বিক সনদ তথা সিডও সনদের যে দুটি ধারা বাংলাদেশ সংরক্ষণ করেছে (অর্থাৎ সমর্থন করেনি) সে দুটি ধারার সংরক্ষণ তুলে ফেলা। মূলত সিডও সনদের ২ এবং ১৬.১(গ) নং ধারা বাংলাদেশ সমর্থন করেনি । ২ নম্বর ধারায় বলা আছে, নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য নিরসনে শরিক দেশগুলো আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেবে এবং আইনের সংস্কার করবে। ১৬.১(গ) ধারায় বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। এই দুটি ধারা অনুসমর্থন করলে সিডও সনদের পরিপূর্ণ স্বাক্ষরকারী হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে সকল ধর্মীয় আইনের উর্ধ্বে উঠে সকল ক্ষেত্রে কথিত "সমানাধিকার" বাস্তবায়ন করা। এবং এজন্য সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট জবাবদিহিতার আওতায়ও আসবে। এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের সেন্টিমেন্ট বিবেচনায় নিয়ে স্বৈরাচার আওয়ামীলীগও এই দুটি ধারা অনুসমর্থন করেনি। দৈনিক প্রথম আলোর ০৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ এর প্রতিবেদনে বলা হয়- "জাতিসংঘের নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডওর গুরুত্বপূর্ণ দুটি ধারা (২ ও ১৬.১.গ) থেকে আপত্তি তুলবে না বলে সিডও কমিটিকে সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে। যুক্তি হিসেবে বলেছে, দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে তালাক ও সম্পত্তি বণ্টন হয়। ভবিষ্যতে আপত্তি তুলে নেওয়া হবে, এবার সে ধরনের কোনো অঙ্গীকারও করেনি সরকার।" যে ধারাসমূহ স্বৈরাচার অনুমোদন করতে ভয় পেয়েছিলো, সেই ধারাসমূহ এদেশের মানুষের রক্তে রঞ্জিত জুলাইয়ের ম্যান্ডেটে আসা সরকারের তৈরি কমিশন অনুমোদন করার সুপারিশ জুলাইয়ের বিপুল গণ আকাঙ্ক্ষার প্রতি চরম অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই নয়। জুলাই অভ্যুত্থানের ফলে তৈরি নারী কমিশন তাদের সুপারিশমালা প্রস্তুতে যাদের সাথে বৈঠক করেছে এটি সম্পূর্ণভাবে একপাক্ষিক। সেখানে এনজিও, কিছু সেক্যুলার গোষ্ঠী এবং পেশাজীবী ছাড়া আর কেউ নেই। এই নারী কমিশনকে জবাব দিতে হবে, যেসব নারীরা পর্দার বিধান রক্ষার জন্য ছবি না তুলে বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে নিজের পরিচয়পত্র করতে চান তাদের সাথে তারা কথা বলেছে কি না, যেসব নারীরা নামায পড়ার জায়গার দাবি করায় ছাত্রলীগের প্রতিহিংসার শিকার হয়েছিলেন তাদের সাথে কথা বলেছে কি না, হিজাব পরার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা যেসব নারী হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন তাদের সাথে কথা বলেছে কি না। এই কমিশন কোটি কোটি গৃহিণীদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ এন্টিটি হিসেবে কাউন্টই করেনি, তাদের সাথে বসেনি, লাখ লাখ মাদ্রাসার ছাত্রীদের সাথে বসেনি, আলিম-উলামা, পাদরি-পণ্ডিত কারো সাথেই বসেনি। বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে এমন কারো সাথে না বসে উলটো রিপোর্টের পাতায় পাতায় ইসলামোফোবিক অথবা ধর্মবিদ্বেষী মন্তব্যে ভর্তি করা হয়েছে। রিপোর্টের ৭০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে "বিয়ের বাইরে যেকোন যৌন সম্পর্ককে পাপ হিসেবে দেখা হয় বলেই যৌন সহিংসতার শিকার নারীকে অচ্ছ্যুত ভাবা হয় ।" এই বাক্য দ্বারা ধর্মবিদ্বেষী নারী কমিশন দাবি করছে মানুষ যে বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্ককে পাপ মনে করে এটা অন্যায়। ধর্মের প্রভাবে যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় বা পাপ-পুণ্যের যে বোধ মানুষের মধ্যে তৈরি হয় নারী কমিশন এই বোধের বিলোপ চান, তারা চান এমন এক ধর্মহীন জনগোষ্ঠী যারা অবাধ যৌনাচারকে পাপ মনে করবে না। এই বাক্য থেকে আরো বোঝা যায়, কালেক্টেভলি সমাজিক মূল্যবোধের বিকৃতি এবং সহমর্মিতার অভাবে ধর্ষিতা নারীর প্রতি যে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পায় নারী কমিশন এর পুরো দায় দিতে চান ধর্মের উপরে, যেন ধর্মই মানুষকে সহমর্মী হতে বাধা দিচ্ছে, যেটা ধর্মের উপর মিথ্যা অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়। এই একটি বাক্যই কমিশনের সদস্যদের ধর্মবিদ্বেষী মনোভাব স্পষ্ট করে, যা একটি গ্রহণযোগ্য সুপারিশমালা প্রণয়নের প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে। যেকোন রাষ্ট্রে সরকার দুই রকমের হতে পারে। এক রকমের সরকার গণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নকে তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করে, অর্থাৎ অর্গানিকভাবে তৈরি জনগণের অভিপ্রায় বাস্তবায়ন করাই নিজেদের প্রধান দায়িত্ব বলে গ্রহণ করে। আরো এক রকমের সরকার গণ কে অজ্ঞ জ্ঞান করে, মনে করে গণের অভিপ্রায় তাদের জন্য কল্যাণকর নয়। তাই এই ধরণের সরকার অন্যান্য সমাজে প্রচলিত বা অপ্রচলিত বিধিব্যবস্থা গণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং দাবি করে এটা গণের উপকারের জন্যই করা হচ্ছে। জুলাই অভ্যুত্থানের ফলে তৈরি সরকারকে ম্যান্ডেট দেওয়া হয়েছে এদেশে গণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করার জন্য। গণের আকাঙ্ক্ষাকে তুচ্ছজ্ঞান করে পশ্চিমের নারীবাদী ধারণা এদেশে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলে এই সরকার তার ম্যান্ডেট হারাবে। অর্গানিকভাবে তৈরি হওয়া ধর্ম, ঐতিহ্য এবং আচার নির্ভর যে পারিবারিক আইন এদেশে চালু আছে এসব আইনই মূলত এদেশের গণের সামাজিক চুক্তি, যে চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নামক এই আধুনিক জাতিরাষ্ট্র। তাই গণের আকাঙ্ক্ষা বিরোধী এই সুপারিশমালা বাতিল এবং কমিশন বিলুপ্ত করে জনরোষ থেকে রক্ষা পাওয়াই হবে সরকারের জন্য সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। এই কমিশনের সুপারিশ যে গণ আকাঙ্ক্ষার সাথে বিরোধ করে এটা যদি সরকার বিশ্বাস না করে, সেক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে একটি অনলাইন পোল তৈরি করতে পারে। যেখানে জনতা মতামত দিবে এই কমিশন এবং কমিশনের সুপারিশমালা জনগণ বাস্তবায়ন চায়, নাকি বাতিল চায়। এরকম একটি পোল হলে ১০ শতাংশ লোকও এসব সুপারিশের পক্ষে থাকবে না, এটা ওপেন চ্যালেঞ্জ করে বলে দেওয়া যায়।

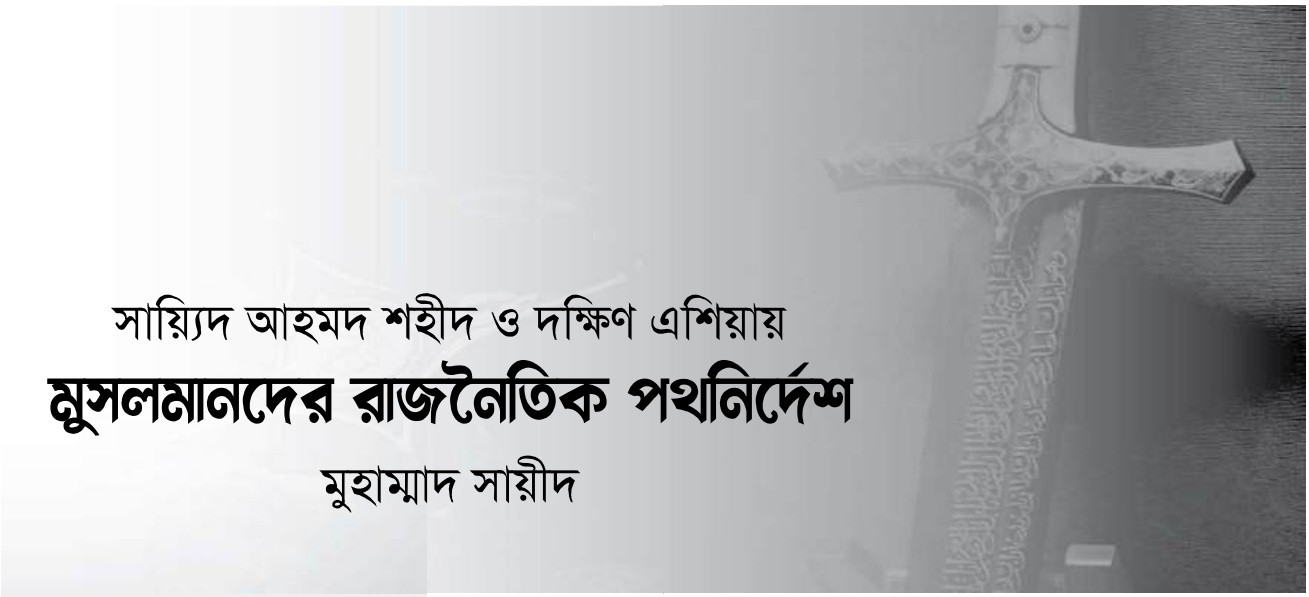

সায়্যিদ আহমদ শহীদ ও দক্ষিণ এশিয়ায়

মুসলমানদের রাজনৈতিক পথনির্দেশ

মুহাম্মাদ সায়ীদ

ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রাথমিক পর্বে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। একের পর এক বিভিন্ন অঞ্চলে বহির্দেশীয় শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম প্রতিরোধ প্রচেষ্টা ব্যর্থতার সম্মুখীন হলে মুসলিম সমাজে বিশাল রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষাপটে ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ও শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর আধ্যাত্মিক দহলিজ প্রাঙ্গণে বেড়ে ওঠা হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) (১৭৮৬–১৮৩১খ্রি.) নিজ হাতে হাল ধরেন; ইসলামী সংস্কার, পুনরুজ্জীবন এবং জিহাদের ধারণায় ভারতের যুগান্তকারী পরিবর্তনের দিকে মনোনিবেশ করেন। সেসময় তিনি তাসাওউফের কোমলতা, শরীআতের নিয়মানুবর্তিতা ও জিহাদের আপোসহীনতার সমন্বয়ে যে পথ-পরিক্রমা রচনা করেছিলেন, সেটি বহুমাত্রিক ঐতিহাসিক মূল্যায়নের মুখোমুখি হয়েছে। তবে তার এই সামগ্রিক আন্দোলনের ব্যাপারে এই সত্য আজও প্রমাণিত যে, এটি দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের জন্য তাৎপর্যবহ ও প্রাতঃস্মরণীয় এক ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হিসেবে অপরিবর্তিত মূল্যে প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে।

> “সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামের মূল শিক্ষায় সমাজকে পুনরায় উজ্জীবিত করা এবং ঔপনিবেশিক শাসন ও স্থানীয় শাসকগোষ্ঠীর অনৈতিক ও যুলমধর্মী কার্যকলাপের ফলে মুসলিম সমাজে যে বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল, তা সংশোধন করা।”

১৭৫৭ সালে পলাশীতে পরাজয়ের পর থেকে ভারতে মুসলিম শাসনের পতন শুরু হয়। এসময় ভারতের শাসনক্ষমতা মুসলমানদের থেকে হাতছাড়া হওয়ার মাধ্যমে কেবল রাজনৈতিকভাবে তারা দুর্বল হয়নি, বরং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবেও ব্যাপক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হয়। সাতশ বছরের মুসলিম শাসনের পর ভারতে এই সময়ে যে বন্ধ্যাবস্থা তৈরি হয়েছিল, তা সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর শিশুমনেও ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করেছিল। বিধায় বাল্যকাল থেকেই তিনি ভারতের মুসলামানদের সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়ন ও ঐ সময়ে আপতিত সংকট উত্তরণের চিন্তা করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি আত্মিক উন্নয়ন, সমাজ সংস্কার ও ইসলামী শরীআহ পুনরুজ্জীবন এবং চূড়ান্ত ধাপে জিহাদের কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর (র.) এর প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামের মূল শিক্ষায় সমাজকে পুনরায় উজ্জীবিত করা এবং ঔপনিবেশিক শাসন ও স্থানীয় শাসকগোষ্ঠীর অনৈতিক ও যুলমধর্মী কার্যকলাপের ফলে মুসলিম সমাজে যে বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল, তা সংশোধন করা। তিনি মুসলিম সমাজে প্রচলিত তাওহীদের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, শিরক, বিদআত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং মানুষের সামনে ইসলামের সঠিক শিক্ষা উপস্থাপন করেন। তাঁর দাওয়াত ছিল কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক খাঁটি ইসলামী জীবনযাত্রার প্রতি প্রত্যাবর্তন, যা মুসলিম সমাজকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে পুনর্গঠনের দিকে ধাবিত করবে। ঔপনিবেশিক শক্তির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও স্থানীয় শাসকদের দুর্নীতি মুকাবিলায় সায়্যিদ আহমদ বেরলভী ‘জিহাদ’ ধারণাকে এক বৈপ্লবিক সমাধান হিসেবে তুলে ধরেন।

সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) শুরুর দিকে তৎকালীন সামাজিক অসঙ্গতিগুলো দূর করার জন্য সংস্কার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। সে সময় ভারতের মুসলিম সমাজে মদপানের অভ্যাস মহামারি আকার ধারণ করেছিল। বেশ কিছু অঞ্চলে হিন্দু রীতির প্রভাবে বিধবা বিবাহের ব্যাপারে মুসলমানদেরও অনীহা তৈরি হয়েছিল। ধর্মকর্ম ও বিশ্বাসে শিআ মতবাদ প্রভাব বিস্তার করেছিল। নিরাপত্তার অজুহাতে ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করা থেকে বিরত থাকার মতো সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছিল। সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এসব কুসংস্কার ও অপচর্চার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচারণা চালিয়ে ব্যাপক সংস্কার সাধনে সফল হোন। তৎকালীন ভারতে মুসলিম জনসমাজের

সামাজিক-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অচলাবস্থা নিরসনকল্পে সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর সংস্কার কার্যক্রমের সাথে একাত্ম হওয়া বিশাল জনগোষ্ঠীর ব্যাপক উৎসাহ এবং তদুপরি সীমান্ত অঞ্চলে পাঠান নেতাদের আনুগত্য সায়্যিদ সাহেবের জন্য ঐ অঞ্চলে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। ফলে নানাবিধ বাধাবিপত্তি উতরিয়ে, সংগ্রাম-জিহাদের মাধ্যমে তিনি আফগানিস্তান-পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চল পেশোয়ারে একটি শরীআহ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হোন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে শিখ-ব্রিটিশ যৌথ আক্রমণের মুখে এবং সীমান্ত অঞ্চলের স্থানীয় পাঠানদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ১৮৩১ সালে বালাকোট যুদ্ধে উপমহাদেশের মুসলমানের সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির মহান স্বপ্নদ্রষ্টার জীবনাবসান ঘটলেও, তার স্বপ্ন ও লক্ষ্য এখনো ভারতের মুসলমানদের জন্য চেতনার বিষয় হিসেবে সমান প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে।

বহু বছর পূর্বে ভারতে ইসলাম ও মুসলমানের যে পরিণতির আশঙ্কা করে তাদের জন্য একটি নিরাপদ আবাস রচনার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এই মুজাহিদ, তাঁর ইন্তিকালের প্রায় দুইশ বছর পরে আজও দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল জুড়ে সে গঞ্জনা ও অসময় কার্যকর অর্থে কাটিয়ে উঠতে পারেনি মুসলিম সমাজ। বাহাদুর শাহের নির্বাসনের মাধ্যমে মুঘল শাসনের পতন পরবর্তী সময় থেকে স্বাধীন হায়দ্রাবাদের অবলুপ্তির পথ ধরে আজকের দিনের বিতর্কিত ভারতের ওয়াকফ বিল প্রস্তাবের সময় পর্যন্ত মুসলমানের যে রাজনৈতিক অবনমন, অন্যদিকে কলকাতার বেঙ্গল রেনেসাঁ থেকে বাংলাদেশের শাহবাগের উল্লম্ফন পর্যন্ত যে সাংস্কৃতিক দমনপীড়ন– এসব কিছু স্পষ্টভাবে সায়্যিদ আহমদের জিহাদ ও রাষ্ট্রসাধনার দিকে ফিরে যাওয়ার পথ নির্দেশ করছে।

দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থান আজ কেমন? –এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মাধ্যমে সায়্যিদ আহমদ শহীদের আন্দোলনের তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। আজকের ভারতে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি মুসলিম বিরোধী সহিংসতায় মেতে উঠেছে। বিজেপি ও তার মূল আদর্শিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) হিন্দু জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে একটি রাজনৈতিক বয়ান নির্মাণ করেছে, যা মুসলমানদের প্রান্তিক করে তুলেছে। এই বয়ানে মুসলমানদের 'অভ্যন্তরীণ শত্রু' হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিক নিবন্ধন (এনআরসি) প্রকল্প, কাশ্মিরের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নীতির পরিবর্তন, ওয়াকফ বিলের মাধ্যমে মুসলমানদের ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়সাধন ইত্যাদি মুসলমানদের অস্তিত্বকে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আজকের হিন্দুত্ববাদী ভারত পুরোপুরি মুসলিম বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছে। মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও ঐতিহ্যবাহী মুসলিম স্থাপনা ধ্বংস করা, শিক্ষানীতি ও পাঠ্যবইয়ে মুসলিমবিদ্বেষ অন্তর্ভুক্ত করা, মুসলিম নারীদের জোরপূর্বক বন্ধ্যাত্বরণে বাধ্যকরণ, গরু রক্ষার নামে মুসলমানদের গণপিটুনির ঘটনা, হিজাব নিষিদ্ধকরণ এবং মুসলিম মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বৈষম্যমূলক আচরণ ইত্যাদি বর্তমান ভারতের মুসলিম বিদ্বেষের উদাহরণ। সর্বোপরি, হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উত্থান ভারতের মুসলমানদেরকে দেশটির অভ্যন্তরে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করে ফেলেছে। ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব হ্রাস পেয়েছে, তাদের আত্মপরিচয় সংকটে পড়েছে এবং তারা মানবাধিকার বঞ্চিত হচ্ছেন। মুসলমানদের নাগরিকত্ব, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক অধিকার সবকিছুই হুমকির মুখে পড়েছে, যা তাদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা ও বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি সৃষ্টি করেছে।

ভারত তো হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র। অবিভক্ত ভারত ভেঙে মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ও পরবর্তীতে সৃষ্ট মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আমাদের এই বাংলাদেশেও ইসলাম আশানুরূপ ভালো অবস্থানে নেই। পশ্চিমা মদদে ক্লাশ অব সিভিলাইজেশনের উপজাত হিসেবে বিশ্বব্যাপী ছড়ানো ইসলাম বিদ্বেষের প্রভাব পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উপরও বেশ প্রবল। ফলে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশ দুটো কাঠামোগত ইসলামবিদ্বেষে আক্রান্ত । পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামরিক শাসন এবং অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় ও জাতিগত বিভাজন দেশটিকে দীর্ঘ সময় ধরে স্থবির করে রেখেছে। তদুপরি পশ্চিমা আধিপত্যের প্রতি নতজানু নীতির কারণে সেখানেও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ইসলামবিদ্বেষের প্রতি প্রশ্রয় রয়েছে । অন্যদিকে ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্বাধীনতা দাবি করলেও স্বাধীনতার পর ভারতের মদদে এদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এদেশে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামবিদ্বেষ রগরগে ছিল। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ভারতের সমর্থনপুষ্ট আওয়ামীলীগের পতনের পর রাষ্ট্রকাঠামোতে ইসলামবিদ্বেষ পূর্বের মতো পৃষ্ঠপোষকতা পাবে না বলে আশা করা হলেও সম্প্রতি নারী সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনায় সে আশা দুরাশায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ইসলামবিদ্বেষের যে ছড়াছড়ি, এর প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গণে স্বকীয়তার জানান দেওয়া প্রয়োজন। সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) এর চিন্তা ও কর্ম এমন সংকট উত্তরণের বলিষ্ঠ পরামর্শ ও পথনির্দেশ নিয়ে হাজির হয়।

রায় বেরেলীর পীর সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর আন্দোলন ছিল সামগ্রিক দাওয়াত থেকে অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু তা একই সাথে এটি ছিল বিপ্লবী ও সূফী মনোভাবাপন্ন। তাছাড়া এই আন্দোলন আরো বৃহৎ পরিসরে প্রবেশ করে একসময় ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রকৃতি গ্রহণ করেছিল। সায়্যিদ আহমদ (র.) তার সমাজ সংস্কার ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জিহাদ প্রচেষ্টার সাথে তাসাওউফের সমন্বয় সাধন করে অভূতপূর্ব দরদভিত্তিক এক দাওয়াত আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন। তার এই কর্মপন্থাকে বিশ্লেষকদের কেউ কেউ 'Neo-Sufism' কিংবা 'Neo-Sufism par excellence' হিসেবে শনাক্ত করেছেন। ইতিহাস বিশ্লেষক ড. মুইন উদ্দীন আহমদ খান বলেন- Tariqah-e-Muhammadiyah movement had taken its birth as a form of neo-Sufism aimed at bringing the Muslims back to the true path of Islam and purging Muslim society of un-Islamic customs and usages. (Tariqah-e-Muhammadiyah Movement: An Analytical Study by Dr. Muin-ud-Din Ahmad Khan)

সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর এমন সংস্কার ও রাষ্ট্রসাধনা ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচিয়ে পুরো উপমহাদেশের মুসলমানের মধ্যে এক শক্তিশালী সংহতির জন্ম দিয়েছিল। ইতিহাস তাই সাক্ষ্য দেয়, তাঁর সংগ্রামের অংশী হওয়ার জন্য ভারতের সীমান্ত অঞ্চল হতে সুদূরে অবস্থিত বাংলার নারীরা নিজেদের অলংকার বিক্রি করে অনুদান পাঠিয়েছিলেন। (দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স, হান্টার)

সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর জিহাদ আন্দোলনের অন্যতম উজ্জ্বল একটি দিক হলো, তিনি জীবন দিয়ে উপমহাদেশের মুসলমানের কাছে ব্রিটিশ শাসনকে Rule of Enemies এবং আগ্রাসন হিসেবে শনাক্ত করে গেছেন। তাঁর প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের পর মুসলমানদের জন্য ব্রিটিশকে শাসক হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া সায়্যিদ আহমদ বেরলভী

(র.) জিহাদের ধারণা এর প্রকৃত ও মৌলিক অর্থে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন মুসলমানদের মধ্যে। তার এই সময়কাল বিবেচনা করলে দেখা যাবে, বিভিন্ন নেতা ও নৃপতি যখন নিজের উদ্দেশ্য উদ্ধারের জন্য দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে জিহাদ নামে আখ্যা দিয়ে ইসলামের একটি অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়কে ব্যাপকভাবে অপব্যবহার করছে। সে সময়েই সায়্যিদ আহমদের শরঈ নির্দেশনা অনুসৃত জিহাদ, মুসলিম সমাজে জিহাদের একটি আদি স্কেচ এঁকে রেখেছে। আমরা দেখি, পশ্চিমা আধুনিকতা উৎপাদিত জ্ঞানতাত্ত্বিক উপনিবেশায়নের মারফতে বিশ্বব্যাপী জিহাদের যে চিত্র প্রচার করা হয়েছে এবং ১/১১ এর পরে যেটি আরো বর্ধিত মাত্রায় বেগবান হয়েছে, বালাকোটের জিহাদের রূপ ও ধরণ এসব মিথ্যাচারকে দারুণভাবে মুকাবিলা করে প্রতিহত করতে সক্ষম। কতিপয় বুদ্ধিবৃত্তিক দাস ছাড়া এই উপমহাদেশের সব মুসলমানের কাছে জিহাদ তার নিজস্ব ধরণেই অবিকৃতভাবে পরিচিত। সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর অভূতপূর্ব সাহসিকতার মাধ্যমে জিহাদের যে দুর্দান্ত আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, তা কেবল তার প্রতিপক্ষকেই নাড়া দেয়নি, বরং তার ইন্তিকালের পরেও ভারত, পাকিস্তান বাংলাদেশসহ পুরো দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের ঘরদোরকে পর্যন্ত স্পর্শ করে গেছে।

আজকে ভারতে যে হিন্দুত্ববাদী সহিংসতার আড়ম্বর প্রস্তুতি, সেখানে আমরা দেখতে পাই আরএসএস কর্মীদেরকে সামরিকভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের "শত্রু" হিসেবে চিহ্নিত করা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক ধরনের মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতি বৈরিতার আবহ তৈরি করতে এবং হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রগঠনের লক্ষ্যে তারা এমন সংগঠিত সহিংসতার আয়োজন করছে। এই পুরো প্রক্রিয়াটা এক ধরনের মিলিটারাইজড (সামরিকীকৃত) রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে। এমতাবস্থায় মুসলিম প্রতিরোধ হিসেবে জিহাদের ধারণার তাজা স্মৃতি হয়ে সামনে আসে বালাকোট। দ্বীনের জন্য, ন্যায়ের জন্য হাসতে হাসতে মরে যাওয়া এবং প্রয়োজনে ভেঙ্গে গেলেও মচকে না যাওয়ার বীরোচিত চেতনা সরবরাহ করে বালাকোট। এ দিক থেকেও সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর কর্মপ্রয়াসে এই অঞ্চলে মুসলমানের জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

এ কালে মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত যে ইসলামী রাজনীতি, এর বহুলাংশই জামালুদ্দীন আফগানীর 'প্যান ইসলামজম' থেকে অনুপ্রাণিত। প্যান ইসলামিজম চিন্তা গঠনে আফগানীকে উদ্বুদ্ধ করেছে সায়্যিদ আহমদ শহীদের জীবনালেখ্য। আফগানীর জীবনী গবেষক আমেরিকান অধ্যাপক Nikki R. Keddie লিখেন– জামালুদ্দীন আফগানী ভারতে সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর বৈপ্লবিক কার্যক্রম ও চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হোন। সায়্যিদ আহমদের চিন্তাভাবনা তাকে পাশ্চাত্যবিমুখ করে তোলে এবং একই সাথে তা তাকে সমসাময়িক ইসলামের সংকটগুলোকে বাস্তবতার সাথে বিচার- বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করে। (An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal-ud-Din 'al-Afghani by Nikki R. Keddie)

যদিও বালাকোটের মহান যোদ্ধা, সায়্যিদ আহমদ শহীদের দেখিয়ে যাওয়া আপোসকামিতামুক্ত ও উন্নতশির রাজনীতির সাথে সমসাময়িক ইসলামী রাজনীতির বেশ কিছু অসামঞ্জস্য রয়েছে, তা সত্ত্বেও এটা বলা যায় যে, মুসলিম বিশ্বের প্রচলিত ইসলামী রাজনীতিকে এখনো আলো দিয়ে যাচ্ছে তাঁর পুনরুজ্জীবনচিন্তা ও জিহাদ আন্দোলন। তিনি তাসাওউফ, তাজদীদ ও জিহাদ– এই বৈশিষ্ট্যত্রয়ের মারফতে এ অঞ্চলের মুসলমান জনসাধারণের সাথে শিকড়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাদের মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন, তা এ অঞ্চলের বর্তমান ভৌগোলিক ভাগ-বিভাজন সত্ত্বেও এখানকার মুসলমানদের অস্তিত্বের সংগ্রামে দরকারি জনসংহতি গঠনের উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছে এখনো। একবিংশ শতকে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম নিধনের প্রতিশ্রুতিতে ভারতে গর্জে ওঠা লোমহর্ষক সহিংস মতবাদ হিন্দুত্ববাদের মুকাবিলার জন্য, নিজের কর্ম ও চিন্তার মাধ্যমে ঊনবিংশ শতকেই কর্মকৌশল প্রণয়ন করে রেখে গেছেন 'রায় বেরেলীর জঙ্গী পীর' সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাহমাতান ওয়াসিআহ)



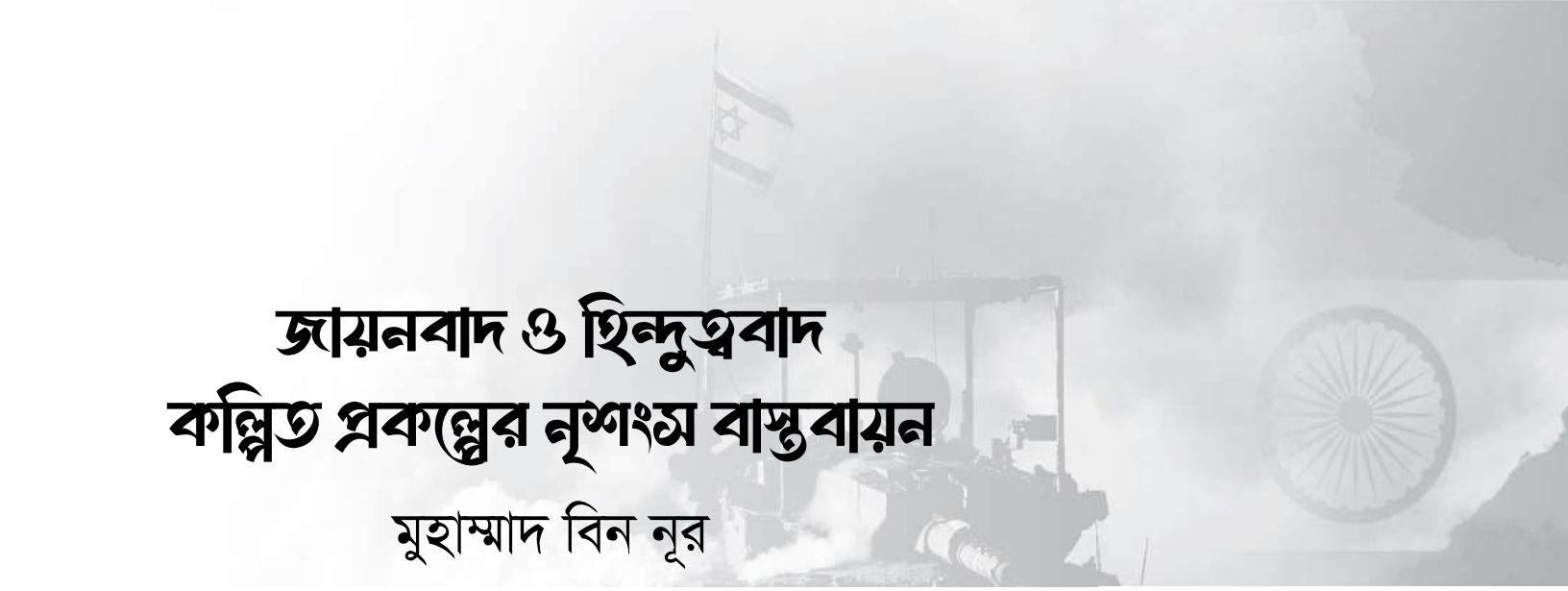

জায়নবাদ ও হিন্দুত্ববাদ
কল্পিত প্রকল্পের নৃশংস বাস্তবায়ন

মুহাম্মাদ বিন নূর

ইয়াহুদীরা দীর্ঘদিন থেকে স্বশাসন থেকে বঞ্চিত, নিজেদের কোন রাষ্ট্র তাদের ছিল না। উপরন্তু তারা নিকট অতীতে ইউরোপীয়দের হাতে এবং এর আগে আরো বহু সাম্রাজ্যবাদের হাতে নৃশংস নির্যাতনেরও শিকার হয়েছিল। বিশেষত হিটলারের জার্মানিতে তারা যে রকম নির্যাতনের শিকার হয়েছিল তা এক কথায় অবর্ণনীয়। ইতিহাসের এক আজব সত্য হলো, এ সব নির্যাতনে অবশ্য তাদের পাশে বহুক্ষেত্রে মুসলমানদেরকেই পেয়েছিল ত্রাতারূপে।

জেরুযালেমের ধুলোময় রাস্তায় একদল মানুষ সমাবেশ করছে ইয়াহুদীদের জন্য একটি নিরাপদ স্বদেশ কায়িমের আশায়, আর দিল্লির রাস্তায় আরেক দল হয়তো মিছিল দিচ্ছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করার আশায়। আপাতদৃষ্টিতে এই দুই দলের দাবি-দাওয়া থেকে শুরু করে কোন কিছুই আপনার কাছে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হবে না। বরং দুই দলের দাবিকেই কিছুটা ন্যায্য দাবি বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে আর বাকি থাকবে না, এ যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ; এবং কোনটাই ন্যায্য তো নয়ই, বরং ভয়ঙ্কর নৃশংস।

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নির্যাতিত ইয়াহুদীরা একটা পর্যায়ে যখন নিজেদের রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো, সেই প্রেক্ষাপটে ইয়াহুদী চিন্তকদের মাথা থেকে জন্ম নিলো জায়নবাদ নামে এক নতুন মতবাদ। ১৮৯০ সালের দিকে সম্ভবত সর্বপ্রথম এই পরিভাষা ব্যবহৃত হয় ইউরোপে, ১৮৯৭ সালে থিওডর হার্জল প্রথম জায়োনিস্ট কংগ্রেস আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই পরিভাষাকে ইয়াহুদীদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হন। ইয়াহুদীদের তখনো নিজস্ব কোন রাষ্ট্র ছিলো না, কোন এক ভূখণ্ডে নিজেদের রাষ্ট্র গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে তাদের এ আন্দোলনের সূচনা । আল-কুদস তথা জেরুজালেমের সিয়োন বা জায়ন পর্বতের নামে তাদের এ মতবাদের বা আন্দোলনের নামকরণ, অর্থাৎ তারা জায়ন পাহাড় তথা আল-কুদসসহ ফিলিস্তিনে নিজেদের রাষ্ট্র কায়িমের স্বপ্ন দেখছিল শুরু থেকেই। জায়ন পাহাড়ের নাম বাইবেলে থাকায় এ নামের প্রতি তাদের স্বভাবতই একটা আলাদা টান ছিল। বংশতাত্ত্বিক বিচারে বেশিরভাগ ইউরোপীয় ইয়াহুদীই আদি ও আসল সেমেটিক ইয়াহুদীদের বংশধর না হলেও তারা নিজেদেরকে সেই রক্তের উত্তরাধিকার দাবি করতে শুরু করে, এবং সেই সূত্রে বাইবেলে বর্ণিত ফিলিস্তিন ও তার আশেপাশের অঞ্চলের ইয়াহুদী রাজ্য পুনরুদ্ধারকে নিজেদের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক অধিকার হিসেবে দাবি করতে থাকে। ফিলিস্তিনের একমাত্র মালিক ইয়াহুদীরা, এ দেশ তাদের পূর্বপুরুষের জন্মভূমি এবং তীর্থভূমি; এমনটাই তাদের বিশ্বাস।

হিন্দুত্ববাদের জন্ম অবশ্য আরো কয়েক দশক পর, এবং ইউরোপ কিংবা ফিলিস্তিনের বহুদূরে, আমাদের এই দক্ষিণ এশিয়ায়। হিন্দু লেখক বিনায়ক দামোদর সাভারকর ১৯২৩ সালে তার বই "হিন্দুত্ব: হু ইজ এ হিন্দু"–তে এই মতবাদের জন্ম দেন । তার মতে, ভারতবর্ষ হলো হিন্দুদের জন্মভূমি এবং পূণ্যভূমি। তার মতে, প্রকৃত ভারতীয় শুধু সেই, যার জন্ম ও ধর্ম দুটিই এই ভূমিতে শিকড় গেড়েছে। ভিন্ন দুই মহাদেশে জন্ম নেওয়া দুটো মতবাদকে কেন একই পাতায় নিয়ে আসা হয়েছে, তা এতক্ষণে পাঠকের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। জায়নবাদ অনুসারে— ফিলিস্তিন কেবল ইয়াহুদীদের, হিন্দুত্ববাদ অনুসারে– ভারত কেবল হিন্দুদের । সাদৃশ্য অবশ্য আরো বহু আছে, পাঠকের সামনে তা ধারাবাহিকভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইয়াহুদীরা দীর্ঘদিন থেকে স্বশাসন থেকে বঞ্চিত, নিজেদের কোন রাষ্ট্র তাদের ছিল না। উপরন্তু তারা নিকট অতীতে ইউরোপীয়দের হাতে এবং এর আগে আরো বহু সাম্রাজ্যবাদের হাতে নৃশংস নির্যাতনেরও শিকার হয়েছিল। বিশেষত হিটলারের জার্মানিতে তারা যে রকম নির্যাতনের শিকার হয়েছিল তা এক কথায় অবর্ণনীয়। ইতিহাসের এক আজব সত্য হলো, এ সব নির্যাতনে অবশ্য তাদের পাশে বহুক্ষেত্রে মুসলমানদেরকেই পেয়েছিল ত্রাতারূপে। সে ভিন্ন কথা। হিটলারের নির্যাতনের শিকার ইয়াহুদীরা তখন শরণার্থী হয়ে অন্যান্য দেশে ঘুরছে। এই পরিস্থিতিতে তাদের জন্য একটি স্বদেশ হয়তো খুব অযৌক্তিক দাবি মনে হবে না আপাতদৃষ্টিতে। কিন্তু জায়নবাদ সে জন্য এমন কোন ভূখণ্ডকে বেছে নেয়নি, যেটাতে তাদের সত্যিকার অর্থে অধিকার রয়েছে

(যেমন জার্মান বা ইউরোপের অন্যান্য দেশ); কিংবা এমন কোন ভূখণ্ডও বেছে নেয়নি, যা কিনা জনমানবহীন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে আঁতাত করে তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত জায়ন পাহাড়ের দেশ তথা ফিলিস্তিনকেই নিজেদের স্বদেশ হিসেবে পেতে চাইলো, এবং বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী উসমানীদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তাদের সে চাওয়া বাস্তবায়িতও হলো। এদিক থেকে অবশ্য হিন্দুত্ববাদের ইতিহাস কিছুটা ভিন্ন। এ কথা সত্যি, তারাও দীর্ঘ সময় ধরে শাসন ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন করতে পারেনি; প্রথমে মুসলিম ও পরবর্তীতে ব্রিটিশদের শাসন মেনে নিতে হয়েছিল। কিন্তু ইয়াহুদীদের মতো তারা দেশ ছাড়তেও বাধ্য হয়নি, কিংবা কোন গণহত্যার শিকারও হয়নি । শাসন ক্ষমতায় না থাকলেও শাসকদের আনুকূল্য পেতে তাদের কখনোই অসুবিধা হয়নি। ব্রিটিশ আমলে তো বটেই, এমনকি মুসলিম শাসনামলেও যোগ্যতার বলে তারা ভালো ভালো রাষ্ট্রীয় পদে অনায়াসেই বসতে পারতো। হিন্দুত্ববাদীরা তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দাক্ষিণ্যে নয়, বরং স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের দেশ পেয়ে যায় ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের পর। এটুকু বেমিল থাকলেও উভয় মতবাদের মিলটা ভয়ঙ্কর। ইয়াহুদীরা যেমন ফিলিস্তিনে মুসলিমদের (এবং খ্রিষ্টানদের) অধিকারকে অস্বীকার করে; হিন্দুত্ববাদীরাও একইভাবে একই ধরনের যুক্তিতে ভূভারতে মুসলিমদের (এবং খ্রিষ্টানদের) অধিকারকে অস্বীকার করে। উভয় মতবাদই এ ক্ষেত্রে কথিত ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করে।

উভয় মতবাদ বিশ্বজুড়ে প্রভাব বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও একই রকমের কৌশল অবলম্বন করে। পশ্চিমা গণমাধ্যমের দক্ষিণে এশিয়া বিষয়ক সংবাদে যেমন হিন্দুত্ববাদীদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব, মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সংবাদে একইভাবে জায়নবাদীদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। শুধু সংবাদেই নয় অবশ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি থেকে শুরু করে প্রযুক্তি– সর্বত্রই একই অবস্থা । তবে ছোট্ট একটা ফারাক আছে অবশ্য, জায়নবাদের সূচনা ইউরোপেই হয়েছে বলে ইউরোপ-আমেরিকায় শুরু থেকেই জায়নবাদীদের বসবাস। ইয়াহুদীদের পাশাপাশি ইভাঞ্জেলিকাল খ্রিষ্টানরাও ইয়াহুদীদের প্রতি বিদ্বেষবশত জায়নবাদে বিশ্বাসী! কিছুটা অদ্ভুত শোনালেও বাস্তবতা এমনই, ইভাঞ্জেলিকাল খ্রিষ্টানদের চাওয়া ইয়াহুদীরা সবাই ফিলিস্তিনে একত্রিত হয়ে যেন ধ্বংস হয়ে যায়। চূড়ান্ত লক্ষ্য ভিন্ন হলেও সে লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে ইয়াহুদী জায়নবাদী আর ইভাঞ্জেলিকাল জায়নবাদী উভয়েই এই মুহূর্তে ফিলিস্তিনের মাটিতে ইসরায়েল রাষ্ট্রকে দেখতে চায়। অন্যদিকে হিন্দুত্ববাদীরা মূলত ইউরোপ আমেরিকার বাসিন্দা না হলেও ভারত থেকে যে প্রচুর ভারতীয় ইউরোপ আমেরিকায় অভিবাসনের পথ বেছে নিয়েছেন, সেই ধারাবাহিকতায় নাগরিকত্বও পেয়েছেন, তাদের কল্যাণে পশ্চিমে তাদের কণ্ঠস্বরও বেশ শক্তিশালী।

উভয় মতবাদের আরেকটি ভয়ঙ্কর সাদৃশ— উভয়েই নিজেদের বিদ্যমান রাষ্ট্রের সীমারেখা নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। জায়নবাদীদের সন্ত্রাসী রাষ্ট্র তো ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনের পুরো ভূখণ্ডকে এখনই নিজের বলে দাবি করে কোথাও সরাসরি বসতি স্থাপন আর কোথাও অবরোধ কিংবা সামরিক উপস্থিতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে; কিন্তু এই ভূখণ্ডই তাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। ইসরায়েলী কট্টরপন্থীদের উপস্থাপিত গ্রেটার ইসরায়েলের মানচিত্রে ফিলিস্তিনের পাশাপাশি জর্ডান ও লেবাননের পুরো অংশ এবং ইরাক, সিরিয়া, মিশর এবং সৌদি আরবের বিশাল অংশ অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ নদী থেকে সমুদ্র অবধি বিস্তৃত ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডই কেবল তাদের কল্পিত গ্রেটার ইসরায়েল প্রকল্পের অংশ নয়; বরং মধ্যপ্রাচ্যের সুবিশাল অংশই তাদের এই প্রকল্পের অংশ, যার মধ্যে কিনা আবার তাদের কথিত অনেক বন্ধুরাষ্ট্রেরও (গাদ্দার আরব রাষ্ট্র) অনেকাংশ অন্তর্ভুক্ত। হিন্দুত্ববাদীদের ক্ষেত্রেও একই কাহিনি। আপাতত তারা ভারত রাষ্ট্র দখল করলেও তাদের দাবিকৃত অখণ্ড ভারতের অংশ হচ্ছে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও তিব্বত। এই পুরো অঞ্চলটি তাদের দাবি মতে কেবলই হিন্দুদের, এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে হিন্দুদের স্বর্ণযুগের আদলে হিন্দু রামরাজ্য। মোদ্দাকথা, এই যে দুই মতবাদই নিজ নিজ ধর্মীয় গ্রন্থকে পুঁজি করে এমন এক প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চায়, যা ঐতিহাসিক কিংবা নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভিত্তিহীন হলেও তাদের কল্পনার রাজ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী। আর তাদের এই কল্পিত প্রকল্প বাস্তবায়নে সবধরনের নৃশংসতাই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য । গাযার সর্বশেষ পরিস্থিতি তার নযীর মাত্র।

তাত্ত্বিক এ সকল সাদৃশ্য এখন অবশ্য বাস্তব বিশ্ব রাজনীতিতেও চলে এসেছে। এক সময় ভারত ছিল ফিলিস্তিনের পক্ষের কণ্ঠস্বর। কিন্তু ২০১৪ সাল থেকে টানা হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারে থাকার ফলে ফিলিস্তিনের পক্ষের অবস্থান থেকে সরে ভারত এখন কট্টর ইসরায়েল সমর্থক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বিশেষত গাযায় চলমান ইসরায়েলী বর্বরতার প্রতিক্রিয়ায় যেখানে ইসরায়েলের বহু মিত্র রাষ্ট্রও তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে বাধ্য হচ্ছে, এমনকি ইউরোপের এসকল দেশ স্বাধীন ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিচ্ছে কিংবা দেওয়ার কথা ভাবছে, সেখানে নরেন্দ্র দামোদর মোদীর ভারত জায়নবাদী দখলদার রাষ্ট্র ইসরায়েলের পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশ দুটির নেতৃত্ব একে অপরের ভূয়সী প্রশংসাও করেছে। জায়নবাদী ইসরায়েল আর হিন্দুত্ববাদী ভারত এখন ঘনিষ্ট মিত্রদেশ। তাদের মধ্যে সামরিক, শ্রম, প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘনিষ্ট সহযোগিতা বেড়েই চলছে। আরো লক্ষণীয় বিষয় হলো– যে সকল আরব রাষ্ট্র প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে ইসরায়েলের সাথে মিত্রতা বজায় রাখছে, নরেন্দ্র মোদীর সাথেও তাদের ঘনিষ্টতা উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, এই উভয় নৃশংস মতবাদই দিনে দিনে আরো আগ্রাসি হয়ে উঠছে। ফিলিস্তিনীদের (প্রধানত মুসলিম এবং কিছু সংখ্যক খ্রিষ্টান) বিরুদ্ধে জায়নবাদীদের বর্বরতার ইতিহাস অনেক পুরনো হলেও বর্তমানে চলমান নৃশংসতা ইতিহাসে নযীরবিহীন। আবার ভারতেও হিন্দুত্ববাদীদের হাতে মুসলিম নিপীড়নের ইতিহাস অনেক পুরাতন হলেও সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দেশটির মুসলিম জনগোষ্ঠীকে রীতিমতো অস্তিত্বের সংকটে ফেলে দিচ্ছে। হিন্দুত্ববাদীদেরও প্রধান টার্গেট মুসলিম, সেই সাথে কিছু সংখ্যক খ্রিষ্টান। উভয় ক্ষেত্রেই দুঃখজনক বৈশ্বিক বাস্তবতা হলো অন্যান্য মুসলিম কিংবা খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলোর নীরব ভূমিকা। খিষ্টান ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস মতে ফিলিস্তিন খ্রিষ্টের জন্মভূমি, যিনি কিনা তাদের তিন ঈশ্বরের একজন। অথচ সেই ফিলিস্তিনে খ্রিষ্টানদের দূরবস্থা নিয়ে খ্রিষ্টান বিশ্ব একেবারেই নীরব। ভারতের খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রেও একই কথা। আর মুসলিম বিশ্বের কথা তো বলাই বাহুল্য।

এখনো সশস্ত্র জায়নবাদীদের তুলনায় সশস্ত্র হিন্দুত্ববাদীরা তুলনামূলক কম আতঙ্ক সৃষ্টি করছে, এতদসত্ত্বেও তাদের আদর্শিক লক্ষ্যের সাদৃশ্য উভয় মতবাদকেই আতঙ্কের উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছে। বলা যেতে পারে মধ্যপ্রাচ্যে জায়নবাদের তুলনামূলক সীমিত সংস্করণ হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার হিন্দুত্ববাদ। ফলে উভয় মতবাদের লক্ষ্যবস্তু হওয়া থেকে বাঁচতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সচেতন সক্রিয়তা আবশ্যিক।

কবি মাওলানা রূহুল আমীন খান-এর
সাক্ষাৎকার

[সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কলামিস্ট, কবি-গীতিকার, ইসলামী চিন্তাবিদ, সংগঠক ইত্যাদি নানা পরিচয়ে স্বনামখ্যাত ব্যক্তিত্ব মাওলানা রূহুল আমীন খান। সমসাময়িক জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ ও মুসলিম বিশ্ব নিয়ে গভীরাশ্রয়ী কলাম রচনায় তাঁর অবস্থান অনন্য। সাংবাদিকতায় তিনি ছিলেন দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক। সংগঠক হিসেবে তিনি বাংলাদেশ জমিয়তুল মোদাররেছীনের যুগ্ম মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন।তিনি বাংলাদেশের তরীকতপন্থি দরবারসমূহের সম্মিলিত প্লাটফর্ম বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদের আহ্বায়ক। আরবী, ফারসি গ্রন্থ অনুবাদে তিনি অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কাসিদায়ে বুরদা, কাসিদায়ে শাহ নিয়ামতুল্লাহ, কালামে ইকবাল, কাসিদায়ে বানাত সোয়াদ, দিওয়ানি ওয়ায়েসি, নালায়ে কলন্দর ইত্যাদি কালজয়ী কাব্যের অনুবাদ করেছেন।লিখেছেন ইসলামী সংগীত গ্রন্থ শারাবান তাহুরা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত মসনবী শরীফের কাব্যানুবাদ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ট সৃষ্টি। স্কুল ও মাদরাসার টেক্সটবুক হিসেবে আকাইদ ও ইসলামিয়াতের বহু পাঠ্যবেই রচনা করেছেন। এছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, ফাতওয়া ও মাসাইল ইত্যাদি অনুবাদ গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। সাংবাদিকতার সুবাদে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো ভ্রমণ করেছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।পথিতযশা এই আলিম ও সাহিত্যিক মনীষার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী। মাসিক পরওয়ানার পাঠকদের জন্য ধরাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো।]

(পূর্ব প্রকাশের পর)

আহমদ হাসান চৌধুরী: ইসলামী কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ইতিহাসজ্ঞান কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

রূহুল আমীন খান: শুধু ইসলামী কবিতার ক্ষেত্রেই নয়, সব ধরনের রচনার ক্ষেত্রে সে গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক ইতিহাসজ্ঞান থাকা অপরিহার্য্য। জাতিসমূহের উত্থান-পতনের কারণসমূহ জানা একান্ত আবশ্যক। তবে ইসলামী কবিতা রচনাকারীদের ইসলামের ইতিহাস ভালো করে অধ্যয়ন করা দরকার। জানা দরকার, সমসাময়িক প্রেক্ষাপট। শুধু অতীত চর্চা নয়, ইসলামী উম্মাহর সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিহাস পর্যালোচনা করে ভবিষ্যৎ কর্তব্যের দিশা থাকাও প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আর বর্তমানের কথা এজন্য বললাম যে, সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে বর্তমান বলতে তো কিছুই নেই। সময়ের যে মুহূর্তটি মিনিট বা সেকেণ্ড তাও তো স্থিত থাকে না। সেকেণ্ডের কম সময়ের পরেই তা অতীত হয়ে যায়। তাই অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে নির্মাণ করতে হবে ভবিষ্যৎ।

আহমদ হাসান চৌধুরী: জীবনের এই পর্যায়ে এসে আপনি কি সন্তুষ্ট?

রূহুল আমীন খান: আলহামদুলিল্লাহ। সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি তো একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। আমি অনেক খ্যাতনামা পীর-মাশায়িখকে পেয়েছি। তাদের অমূল্য সান্নিধ্য, স্নেহ ও দুআ পেয়েছি। তাঁদের থেকে অনুপ্রেরণাও লাভ করেছি। এটা আমার পরম পাওয়া, পরম সৌভাগ্য। আর দেবার কথায় যদি আসি তবে একটা অতৃপ্তিবোধ হামেশা আমাকে কষ্ট দেয়। খোদাদাদ নিআমত যেটুকু আমি পেয়েছিলাম তার সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারিনি। অলসতায় অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফেলেছি। মাঝে মাঝে কবির ঐ কাব্যাংশটুকু মনে জাগে: দিন ফুরায়ে যায়রে, আমার দিন ফুরায়ে যায়/মাঝের রবি ডুবছে সাঁঝে/দিনটা গেল বৃথা কাজে/এক পা কেবল পাড়ে আছে এক পা দিছি নায়/ দিন ফুরায়ে যায়রে, আমার দিন ফুরায়ে যায়।

আহমদ হাসান চৌধুরী: ছারছীনার পীর ছাহেবের ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাই।

রূহুল আমীন খান: ছারছীনার পীর ছাহেব বলতে আপনি বোধহয় হযরত মাওলানা শাহ আবূ জাফর মো: ছালেহ (র.) সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন। ছারছীনা সিলসিলার প্রথম পীর ছিলেন হযরত মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (র.)। তিনি ছিলেন ফুরফুরার হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী আল কুরাইশী (র.) এর প্রধান খলীফা। হযরত মাওলানা নেছার উদ্দীন (র.) কে শৈশবে আমাদের বাড়ির মাদরাসা ময়দানের সভায় আমি দেখেছি। তবে তাঁর চেহারা স্পষ্টভাবে মনে করতে পারি না। তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র ও জানসীন হযরত মাওলানা শাহ আবূ জাফর মো: ছালেহ (র.) এর সাথে সাক্ষাৎ হয় শৈশবেই। তিনি প্রতি বছরই আমাদের মাদরাসা-ময়দানে সভা করতেন। দাখিল পরীক্ষার পর তাঁর সাথে বেশ কিছুদিন আমি তাবলীগী সফরে ছিলাম। তখন রাস্তাঘাট তেমন ছিল না। গাড়ি চলাচল করতো না আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে। সফর হতো বোটে। বোট টেনে নিয়ে যেত ছোট একটি লঞ্চ। তিনি

ছিলেন তাঁর মহান পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী। তিনি তাঁর পিতার মতো বহুমুখী দ্বীনী খিদমাত চালিয়ে গেছেন আজীবন। দেশের বিভিন্ন স্থানে কায়িম করেছেন বহু মাদরাসা, তরীকা-তাসাওউফের খানকা ও তালীমী জলছা। উচ্ছেদ করেছেন শিরক বিদআতের বহু আড্ডা। কায়িম করেছেন সুন্নাত তরীকা। তাঁর মুরীদ মুতাকিদগণকে সুন্নাত মুতাবিক দাড়ি রাখার তিনি জোর তাকীদ দিতেন। তাদের নিসফে সাক জুব্বা পরিধান করতে হতো, টুপি ও পাগড়ি পরিধান করতে হতো। নিয়মিত যিকর-আযকার করতে হতো। তিনি দ্বীনী খিদমাত আঞ্জাম দেওয়ার জন্য বেশকিছু সংগঠন ও ফান্ড কায়িম করেন। তার মধ্যে জমিয়তে হিযবুল্লাহ, ছাত্র হিযবুল্লাহ, ইয়াহইয়া সুন্নাত ফান্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পাক্ষিক তাবলীগ নামে একটি দ্বীনী পত্রিকা তাঁর আব্বা হুযুরই প্রকাশ করেছিলেন সেটি এখনো প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া দ্বীনী মাসআলা-মাসাইলের কিতাব তরীকুল ইসলাম, তরীকতের কিতাব তালীমে মারিফত, হাকীকতে মারিফতে রাব্বানিয়্যাসহ বেশকিছু শরীআত ও মারিফতের কিতাব প্রকাশ করে গেছেন (যার অধিকাংশ তাঁর পিতার রচনা করা)। ছারছীনায় একটি ছাপার মেশিনও বসিয়েছিলেন। কামিল স্তর পর্যন্ত মাদরাসা, হিফযখানা, লিল্লাহ বোডিং ইত্যাদি তাঁর পিতাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সেসব প্রতিষ্ঠান আরো সম্প্রসারিত করেন। তাঁর পিতা ও তিনি কখনো সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। তবে ব্রিটিশ আমল থেকে ইসলাহে কওম ও হুকুমতের জন্য অরাজনৈতিকভাবে সাধ্যানুযায়ী প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তার মধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কলকাতা মুহাম্মদ আলী পার্কে সর্বদলীয় উলামা-মাশায়িখ সম্মেলন, সিলেট রেফারেন্ডামে সিলেটে প্রায় তিন মাস অবস্থান করে সিলেটবাসীকে পাকিস্তানের পক্ষে ভোটদানে উদ্বুদ্ধকরন এরূপ বেশ কিছু ঐতিহাসিক খিদমাত আনজাম দিয়েছেন। রাজনীতিকদের দ্বীন প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছেন।

আমি শৈশবকালে তাঁর সাক্ষ্য পেয়েছি, ছাত্রজীবনেও তাঁর সান্নিধ্যে বহুদিন কাটিয়েছি। মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ, বাগদাদ শরীফসহ বিদেশে ও দেশে তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছি। আমার ক্ষুদ্র শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন খিদমাতে অংশগ্রহণ করেছি। ইন্তিকালের সময় এবং দাফন-কাফনের সময়ও তাঁর নিকটে থাকার ভাগ্য আমার হয়েছে।

সুন্নাতের ইত্তিবায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। তিনি কখনো নামাযের জামাআত তরক করতেন না, তা বাড়িতেই হোক আর সফরেই হোক। এমনকি উড়োজাহাজে ভ্রমণকালেও কোনোরূপ একটু জায়গা করে নিয়ে জামাআতে নামায আদায় করতেন।

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর সাথে তাঁর অনেকটা মিল ছিল বলে আমার মনে হয়েছে। মৌলভীবাজারে অনুষ্ঠিত এক মাহফিলে তাঁরা দুজনই অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই মাহফিলের মঞ্চে বসেই ছারছীনার ছাহেব কিবলাহ আমাকে ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

ছারছীনার পীর ছাহেবের সাথে মক্কা মুকাররামা, মদীনা মুনাওয়ারা, বাগদাদ শরীফ প্রভৃতি পবিত্র ও ঐতিহাসিক স্থানে যিয়ারতের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে সবের বর্ণনা দিতে গেলে সাক্ষাৎ কলেবর অনেক বড় হয়ে যাবে। তবে একটি ঘটনার সাথে আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, সেটা পেশ করার ইচ্ছেটা সামলাতে পারছি না। ঘটনাটি এই–

ছারছীনার মরহুম পীর হযরত মাওলানা শাহ আবূ জাফর মো: ছালেহ (র.) এর সাথে একবার মদীনায়ে তায়্যিবাস্থ নেছারিয়া মুসাফিরখানায় ছিলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বরে তিনি আক্রান্ত হলেন।

কাঁপছিলেন থরথর করে। কম্বল ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণ গায়ে চাপানো হলেও থামছিল না কম্পনের মাত্রা। আমাকে বললেন, গায়ের উপরে উঠে তাঁকে চেপে ধরতে। সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। তবুও তাকীদে তাই করলাম। ২/৩ দিন এ অবস্থা চলল। সেদিন মসজিদে নববীতে যুহরের আযান হলে হুযুর আমাকে বললেন, যাও জামাআতে শরীক হও। নামায শেষে যিয়ারতের পর রাওদা মুবারকের সামনে দাঁড়িয়ে আমার নাম ধরে বলবে ইয়া রাসূলাল্লাহ! মো. ছালেহ অসুস্থ হয়ে পড়েছে আপনার যিয়ারতে আসতে পারছে না। নামায শেষে রাওদা পাকের সামনে দাঁড়িয়ে যেমনটা হুযুর বলে দিয়েছিলেন তেমনটা বললাম। মুসাফিরখানায় ফিরে দেখতে পেলাম তিনি দাঁড়িয়েছেন এবং দু'এক কদম হাঁটছেন। মাগরিবের সময় দেখলাম তিনি পূর্ণ সুস্থ। আমরা একসাথে মসজিদে নববী শরীফে গেলাম এবং নামায শেষে তিনি রাওদা মুবারকের সামনে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ধরে যিয়ারত ও দুআ করলেন। এ সময় আমি মদীনা শরীফের অন্যান্য যিয়ারতের স্থানসমূহ যিয়ারত করলাম। একে একে সালমান ফারসীর খেজুর বাগানে গেলে একটা দীর্ঘ ও প্রাচীন খেজুর গাছ দেখিয়ে মদীনায় দীর্ঘদিন বসবাস করছেন এমন বাঙালি মুআল্লিম বললেন, এ গাছটি আল্লাহর হাবীব নিজ হাতে রোপণ করেছেন। আবেগে গাছটিকে জড়িয়ে ধরলাম, চুমু খেলাম। পরবর্তীকালে হজ্জ-উমরাহ করে মদীনা মুনাওয়ারা যখন গেলাম তখন ঐ বাগানে গিয়ে দেখলাম গাছটি আর নাই। শুনলাম ওহাবীরা ঐ সাহাবী গাছটি কেটে টুকরো করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে। আর একদিন মসজিদে কুবা, মসজিদে যুল কিবলাতাইন যিয়ারত করলাম। শুহাদায়ে উহুদের গোরস্থান যিয়ারত করতে গেলে ওয়াদিয়ে জিনের সম্মুখস্থ রাস্তাটি দেখিয়ে মুআল্লিম বললেন, এখানে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলেও নিজে নিজেই চলে, নিচ থেকে উপরের দিকেও ওঠে। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে চাবিটি আমাদের হাতে দিয়ে দিল এবং শুধু হুইল ধরে থাকলো। গাড়ি ক্রমে দ্রুত গতিতে চলতে লাগলো। নিচ থেকে টিলার উপরদিকেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে উঠল। আমরা স্বচক্ষে এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি দেখলাম। আমরা ঐতিহাসিক বদর ময়দানে গিয়েও শুহাদায়ে বদরের মাযার যিয়ারত করলাম।

আহমদ হাসান চৌধুরী: মাওলানা এম এ মান্নান সাহেবের ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাই।

রূহুল আমীন খান: আমি তাঁকে প্রায় অর্ধশত বছর ধরে নিবিড় নৈকট্যে থেকে দেখেছি। তাঁর তত্ত্বাবধানে থেকে অনেক কাজ করেছি। অনেক দেশ সফর করেছি। এক পীরানা ঘরানায় তাঁর জন্ম। তাঁর নানা ও পিতা ছিলেন ফুরফুরার পীর ছাহেব কিবলাহ হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দিকী আল কুরাইশীর খলীফা। তাঁর

বড় তিনটি কাজ হলো-

১. জমিয়াতুল মোদার্রেছীনকে শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

২. দৈনিক ইনকিলাব প্রতিষ্ঠা করা।

৩. মসজিদে গাউসুল আযম বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী ও জমিয়াতুল মোদার্রেছীন কমপ্লেক্স কায়িম করা।

এছাড়া তিনি বেশ কয়েকটি মাদরাসা, মসজিদও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

আমি তাঁকে দেখেছি শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন কিতাব পড়াতে। সিহাহ সিত্তাহর দারস দিতে। প্রিন্সিপাল হিসেবে কামিল মাদরাসা পরিচালনা করতে। সংগঠক হিসেবে জমিয়াতুল মোদার্রেছীন ও শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন কায়িম করতে ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, উদার দিল, দানশীল ও মেহমান নেওয়াজ। একজন সফল রাজনীতিকও ছিলেন তিনি। একাধিকবার তিনি এমপি ও মন্ত্রী হয়েছেন। ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত হিসেবে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশে তিনি ছুটে গিয়েছেন। আন্তঃরাষ্ট্রীয় বহু সমস্যার সমাধানে অবদান রেখেছেন। আমি তাঁর সাথে মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ, বাগদাদসহ ইরাকের বিভিন্ন শহর ও ঐতিহাসিক স্থান, সিরিয়া, জর্দান ও মিশরের বহু ঐতিহাসিক স্থান, স্থাপনা ও মাযার যিয়ারত করার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর সফরসঙ্গী হয়ে। আউলিয়ায়ে কিরামের ভক্ত ও অনুরাগী ব্যক্তি তাঁর মতো আমি কমই দেখেছি। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে তাঁর অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক থাকায় সে দেশে মন্ত্রীবর্গ বিশিষ্টজনেরা তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। ইরাকের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তের বসরা থেকে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের নাইনোয়া পর্যন্ত ভ্রমণ ও বিভিন্ন মাযার ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শনের সময় তাঁর গাড়ির সামনে ও পেছনে সিকিউরিটির লোকসহ কার রাখা হতো। আমাকে সবসময় এসব সফরকালে তিনি সঙ্গে রাখতেন।

মাওলানা এম এ মান্নানকে ছারছীনার পীর ছাহেব কিবলাহ যেমন পুত্রবত স্নেহ করতেন তেমনি ফুলতলীর ছাহেব কিবলাহও অত্যন্ত স্নেহ করতেন। মহান আল্লাহ তাঁর সব খিদমত কবূল করুন ও জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন।

আহমদ হাসান চৌধুরী: ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাই।

রুহুল আমীন খান: ছাহিবে কাশফ ও কারামত মুরশিদে বরহক আল্লামা ছাহেব কিবলাহর কিছুটা সাহচর্য এবং নিজ সন্তানবত তাঁর স্নেহ ও দুআপ্রাপ্তি আমার জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর ইন্তিকালের পর আমি তাঁর শানে এক মর্সিয়ায় লিখেছিলাম:

শরীআতের হাদী, তরীকতের বাদশাহ
হাকীকতের খনি, মারিফত শাহানশাহ
যুগের মুজাদ্দিদ, মুরাদে আউলিয়া
আশিকে ইলাহী, আশিকে মাদীনা।

আল্লাহ পাকের অফুরন্ত মেহেরবাণীতে, অপ্রত্যাশিতভাবেই আমি তাঁকে লাভ করেছি। তিনি আমাকে নিজ পুত্র বলে ঘোষণা দিয়েছেন, এটা অনেকেই জানেন। তাঁর সাক্ষাৎ লাভের পর থেকে ইন্তিকালের সময় পর্যন্ত এবং ইন্তিকালের পরেও অদ্যাবধি আমি তাঁর নেক নযরে ছিলাম ও আছি। দেশে বসে কখনো কখনো এবং লন্ডন (ইউকে) সফরে একমাসব্যাপি তাঁর একান্ত সান্নিধ্য লাভে আমি ধন্য হয়েছি। কাউকে কাউকে আল্লাহ পাক তার জন্ম থেকেই নিজ দ্বীনের জন্য মনোনীত করে থাকেন। ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী ছিলেন তেমনি এক আল্লাহর মনোনীত ওলীয়ে কামিল। এটা আমার সুদৃঢ় প্রত্যয়। আপনার (আহমদ হাসান চৌধুরী) সম্পাদনায় ২০১৪ সালে প্রায় হাজার পৃষ্ঠার স্মারকে আমি যে নিবন্ধটি লিখেছিলাম তার কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করাকে আমি প্রাসঙ্গিক মনে করি।

তিলাওয়াতে কুরআনে, তালীমে কুরআনে যিনি রঈসুল কুররা
ইলমে যাহিরে যিনি শামসুল উলামা
ইলমে বাতিনে যিনি কাশফ ও কারামতওয়ালা মুরশিদে কামিল ও মুকাম্মিল
ওয়াইয ও মুবাল্লিগ হিসেবে যার খ্যাতি বিশ্বজোড়া
সমাজ সংস্কারক হিসেবে যার অবদান অবিস্মরণীয়
রাজনীতিক হিসেবে যার ভূমিকা ইতিহাসখ্যাত
বাতিলের বিরুদ্ধে, অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যিনি আপসহীন
অকুতোভয় মর্দে মুজাহিদ, বীর সিপাহসালার
মেহমানদারিতে, আতিথেয়তায় যিনি অদ্বিতীয়
বদান্যতায় দানশীলতায় যিনি যুগের হাতিমতায়ী
হুব্বে রাসূল ইশকে রাসূলে যিনি বাংলার উয়াইস কারনী
আধ্যাত্মিক শের-শায়েরীতে যিনি বাংলার রূমী
যিনি ইয়াতীম, অনাথ, দুস্থ-দুর্গত মানুষের পরম সুহৃদ
সেবায় নিবেদিত যিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের
জ্ঞান মনীষা, প্রজ্ঞা পাণ্ডিত্যে, যিনি অনন্য
ভদ্রতায় শরাফতীতে যিনি প্রবাদতুল্য।

এমন এক ইনসানে কামিল ছিলেন ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী। তিনি যেমন হাজার হাজার লোকের ওয়াজ মাহফিলে ওয়াজ করেছেন তেমনি নির্জন পাহাড়ে গিয়ে চিল্লাও দিয়েছেন।

তিনি যেমন মাদরাসার ক্লাসরুমে হাদীসের দারস দিয়েছেন তেমনি বাতিলের মুকাবিলায় হায়দরী হিম্মত নিয়ে শির উঁচু করে বুক ফুলিয়ে সামনে এগিয়ে গেছেন।

তাঁকে দেখামাত্র গুলির অর্ডারকে উপক্ষো করে জনসভায় উপস্থিত হয়ে উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দিয়েছেন।

আমি যুক্তরাজ্যের (UK) বিভিন্ন শহরে দেখেছি তিনি যেখানেই গেছেন দূরদুরান্ত থেকে অসংখ্য লোক এসেছেন, তাঁর সাথে মুলাকাত করতে, দুআ নিতে, ঝাড়-ফুঁক তাবীয নিতে। তারা সঙ্গে সঙ্গে তাতে উপকৃতও হয়েছেন।

তিনি বহু মাদরাসা কায়িম করেছেন। নিজ বাড়িতে, সিলেট শহরে এমনকি সুদূর লন্ডনেও প্রতিষ্ঠা করেছেন দ্বীনি শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরের (কামিল) মাদরাসা। কায়িম করেছেন ইয়াতীমখানা। তিনি ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রায় হাজার গাড়ি নিয়ে সিলেট-ঢাকা লংমার্চ করেছেন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন ও অসাধারণ খিদমাতে খালকের বিবরণ তুলে ধরা এই স্বল্প পরিসরের সাক্ষাৎকারে সম্ভব নয়। (চলবে)



তাসাওউফের পরিচয় ও আউলিয়ায়ে কিরামের ফদীলত সম্পর্কে কিছু হাদীস

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٤)﴾ يونس

-সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলীদের (বন্ধুদের) কোনো ভয় নেই,আর তারা দুঃখিতও হবে না। তারা এমন লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার সাথে জীবনযাপন করত। তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। আল্লাহর বাণী পরিবর্তন হয় না। এটিই তো চূড়ান্ত সফলতা।

আবূ যার গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা (যুহদ) মানে এই নয় যে, হালালকে হারাম করে ফেলো, বা সম্পদ নষ্ট করো। বরং দুনিয়াতে যুহদ হলো—তোমার হাতে যা আছে, তার উপর তোমার ভরসা যেন আল্লাহর হাতে যা আছে তার চেয়ে বেশি না হয়। আর যখন কোনো বিপদে পড়ো, তখন সেই বিপদের প্রতিদান ও সওয়াবের প্রতি তোমার আগ্রহ যেন বেশি হয়, এই চিন্তা নিয়ে যে, যদি ওই বস্তু তোমার কাছেই রয়ে যেত।

হিশাম বলেন, আবূ ইদ্রিস আল-খাওলানী এই হাদীসের তুলনা করতেন বিশুদ্ধ স্বর্ণের সাথে, যেমন খাঁটি সোনা ইব্রীজ।[১]

ইমাম জাফর আস-সাদিক (ওফাত ১৪৮ হি.) রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

مَنْ عَاشَ فِي ظَاهِرِ الرَّسُولِ فَهُوَ سُنِّيٌّ ، وَمَنْ عَاشَ فِي بَاطِنِ الرَّسُولِ فَهُوَ صُوفِيٌّ

-যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহ্যিক জীবনের অনুসরণে জীবন যাপন করে, সে হচ্ছে একজন সুন্নী, আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তর্নিহিত জীবনের অনুসরণ করে, সে হচ্ছে একজন সূফী।

ইমাম হাফিয আবূ নাঈম বলেন,

وَأَرَادَ جَعْفَرٌ بِبَاطِنِ الرَّسُولِ ﷺ أَخْلَاقَهُ الطَّاهِرَةَ، وَاخْتِيَارَهُ لِلْآخِرَةِ، فَمَنْ تَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِ الرَّسُولِ ﷺ، وَتَخَيَّرَ مَا اخْتَارَهُ، وَرَغِبَ فِيمَا فِيهِ رَغِبَ ، وَتَنَكَّبَ عَمَّا عَنْهُ نَكَبَ، وَأَخَذَ بِمَا إِلَيْهِ نَدَبَ، فَقَدْ صَفَا مِنَ الْكَدَرِ، وَنُجِّيَ مِنَ الْعَكَرِ، وَنُجِّيَ مِنَ الْغِيَرِ، وَمَنْ عَدَلَ عَنْ سَمْتِهِ وَنَهْجِهِ وَعَوَّلَ عَلَى حُكْمِ نَفْسِهِ وَهَرَجِهِ، وَسَعَى لِبَطْنِهِ وَفَرْجِهِ، كَانَ مِنَ التَّصَوُّفِ خَالِيًا، وَفِي التَّجَاهُلِ سَاعِيًا، وَعَنْ خَطِيرِ الْأَحْوَالِ سَاهِيًا.

তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর "অন্তরের অনুসরণ" বলতে বুঝিয়েছেন—

তাঁর পবিত্র চরিত্র, আখলাক, আখিরাতকেন্দ্রিকতা এবং দুনিয়া থেকে বিমুখতা।

অতএব,যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্রে নিজেকে গঠিত করে,তাঁর পছন্দকে নিজের পছন্দ বানায়,তাঁর রুচিতে রুচি রাখে,যে কাজ থেকে তিনি মুখ ফিরিয়েছেন, সেও সেদিকে ফিরেও তাকায় না, যে দিকে তিনি আহ্বান করেছেন, সেটিকে আঁকড়ে ধরে—তাহলে সে হয়ে যায় পরিষ্কার কাঁচের মতো স্বচ্ছ, সে মুক্ত থাকে মনের মলিনতা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে, সে রক্ষা পায় নাফস ও শয়তানের ধোঁকায় পতিত হওয়ার ভয়াবহতা থেকে।

আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ পথ ছেড়ে দিয়ে, নিজের মন ও প্রবৃত্তির অনুসরণে চলে, পেট ও কামনাকে কেন্দ্র করে জীবন গড়তে চায়—সে তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধির কোনো সৌন্দর্যই অর্জন করেনি, বরং অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে এবং আত্মিক ধ্বংসের আশঙ্কার মধ্যেই রয়েছে।[২]

ইমাম শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত ২০৪ হি.) বলেন,

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، وَيَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ، فَلَا تَعْتَبِرُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِضُوا أَمْرَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

-তোমরা যদি কোনো ব্যক্তিকে পানির উপর দিয়ে হাঁটতে দেখো, কিংবা আকাশে উড়তে দেখো—তাহলেও তাকে গুরুত্ব দিও না, যতক্ষণ না তার কার্যকলাপ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাচাই করে নাও।[৩]

সুলতানুল আরিফীন আবূ ইয়াযিদ আল-বুস্তামী (ওফাত ২৬১ হি.) রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

لِلهِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ يَمْشُوْنَ عَلَى المَاءِ، لاَ قِيْمَةَ لَهُمْ عِنْدَ الله، وَلَوْ نَظَرْتُمْ إِلَى مَنْ أُعْطِيَ مِنَ الكَرَامَاتِ حَتَّى يَطِيْرَ، فَلاَ تَغْتَرُّوا بِهِ حَتَّى تَرَوا كَيْفَ هُوَ عِنْدَ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَحِفْظِ الحُدُوْدِ وَالشَّرْعِ

-আল্লাহর এমন অনেক সৃষ্টি আছে যারা পানির উপর দিয়ে হাঁটে,তবে আল্লাহর কাছে তাদের কোনো মূল্য নেই। আর যদি তোমরা এমন কাউকে দেখো যার নিকট এমন সব কারামত রয়েছে, যে সে আকাশে উড়তে পারে—তবুও তোমরা তার দ্বারা প্রতারিত হয়ো না,যতক্ষণ না দেখো সে কীভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, হালাল-হারামের সীমা রক্ষা করে, এবং শরীআতের বিধানকে সম্মান করে।[৪]

তাসাওউফ কী?

তাসাওউফ (تصوف) হল দ্বীনের তিনটি স্তরের (ইসলাম, ঈমান, ইহসান) মধ্যে একটি স্তর — ইহসান।

এটি জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা, যেমন ফিকহ ও নাহুর (ব্যাকরণ) জ্ঞান। তাসাওউফেরও নিজস্ব মাযহাব, মাদরাসা, ও ইমামগণ রয়েছেন।

এই ইলমকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়, যেমন:

১. তাসাওউফের জ্ঞান (علم التصوف),
২. তাযকিয়া/আত্মশুদ্ধির জ্ঞান (علم التزكية),
৩. আখলাকের জ্ঞান (علم الأخلاق),
৪. চরিত্র গঠনের জ্ঞান (علم السلوك)।

তাসাওউফ হলো...

• আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির সাথে সুন্দর ব্যবহার।
• চরিত্র, কোনো চাকরি বা পদ নয়।
• একনিষ্ঠতা, কোনো সিংহাসন বা ক্ষমতা নয়।
• আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির সাথে উত্তম ব্যবহার, এটি অহংকার বা অনুসারীদের সংখ্যা নয়।
• রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মহান চরিত্র—কোনো উপহার বা দুনিয়াবি সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার নয়।
• আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের ভালোবাসা, দুনিয়া, গোমরাহ ও গযবপ্রাপ্তদের ভালোবাসা নয়।
• তাসাওউফ হচ্ছে ইহসান—আল্লাহকে এমনভাবে ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখছো, বা অন্তত বুঝছো তিনি তোমাকে দেখছেন।
• তাসাওউফ হলো গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর প্রতি সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ (مراقبة الله).
• তাসাওউফ হলো আল্লাহর দিকে আত্মিক সংযুক্তি ও আধ্যাত্মিকতা, ভ্রান্ত রাহবানিয়াত (জগৎ ত্যাগ) বা কুসংস্কার নয়।
• তাসাওউফ হলো ত্যাগ ও আত্মশুদ্ধি।
• তাসাওউফ হলো প্রতিটি কাজ, প্রতিটি মুহূর্তে ইহসানের সাথে অর্থাৎ সুন্দরতম পন্থায় সম্পাদন করা।

সাররী আস-সাকতী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

التَّصَوُّفُ خُلُقٌ كَرِيمٌ، يُخْرِجُهُ الْكَرِيمُ إِلَى قَوْمٍ كِرَامٍ

তাসাওউফ হলো এক মহৎ চরিত্র, যা মহান দাতা আল্লাহ তাআলা মর্যাদাসম্পন্ন মানুষদের মাঝে প্রকাশ করেন।

ইবনু খালদূন বলেন,

সপ্তদশ অধ্যায়: তাসাওউফের জ্ঞান সম্পর্কে

এই জ্ঞানটি (তাসাওউফ) শরীআতের অন্তর্ভুক্ত একটি জ্ঞান, যা মুসলিম উম্মাহর ভিতরে পরবর্তীকালে জন্ম নিয়েছে, তবে এর মূল ভিত্তি ও রীতি ছিল সাহাবা, তাবিঈন এবং তাদের পরে আসা উম্মতের বড়দের মাঝে। এই পথই ছিল হক ও হিদায়াতের পথ।

এবং এর মূলনীতি হলো:

• ইবাদতে নিমগ্ন থাকা,
• আল্লাহর দিকে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করা,
• দুনিয়ার চাকচিক্য ও শোভা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া,
• মানুষজন যেসব ভোগ-বিলাস, সম্পদ ও মর্যাদার পেছনে ছুটে—তা থেকে বিরত থাকা,
• এবং খালওয়াত (একান্ত নির্জনতা)-এর মাধ্যমে মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে একাকী হয়ে ইবাদতে রত থাকা।

এই মানসিকতা **সাহাবায়ে কিরাম ও সালাফে সালিহীনদের মাঝে ব্যাপক ছিল।**

কিন্তু যখন দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী ও তার পর থেকে দুনিয়ার প্রতি মানুষের ঝোঁক বৃদ্ধি পেতে থাকে,মানুষ দুনিয়াবি সম্পর্ক ও সম্পদের সাথে জড়িয়ে পড়ে—তখন যারা ইবাদত ও আল্লাহর দিকে ঝুঁকে ছিল,তাদেরকে **"সূফী"** নামে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হতে থাকে।[৫]

এই বিষয়ে আমি আরো সবিস্তারে আলোচনা করেছি আমার "আত তাসাওউফ ওয়াল মুহাদ্দিসূনা মিনাস সূফিয়্যাহ" (التصوف والمحدثون من الصوفية) নামক কিতাবে।

আল্লাহর ওলীদের ফদীলত বিষয়ে ৪০ হাদীস

হাদীস-১

روى البخاري:عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ

বুখারী (র.) বর্ণনা করেন, আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে দুশমনি রাখে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।

আমার বান্দা যে সমস্ত ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিল করে থাকে, তার মধ্যে ঐ ইবাদতের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় আর কোন ইবাদত নেই যা আমি তার উপর ফরয করেছি। আর বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি কোন কাজ করতে চাইলে তা করতে কোন দ্বিধা করি-না, যতটা দ্বিধা করি মুমিন বান্দার প্রাণ নিতে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে কষ্ট দেওয়াকে অপছন্দ করি।[৬]

হাদীস-২

ইমাম আহমাদ (র.) বর্ণনা করেন,

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ أَذَلَّ لِي وَلِيًّا، فَقَدْ اسْتَحَلَّ

مُحَارَبَتِي، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَإِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ، مَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ وَفَاتِهِ، لِأَنَّهُ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ "

হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীকে (বন্ধুকে) অপমান করে, সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

আমার বান্দা এমন কিছু দিয়ে আমার নিকটবর্তী হতে পারে না, যা আমার উপর ফরযকৃত আমলগুলোর চেয়ে বেশি প্রিয়। আর সে ক্রমাগত নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি। যদি সে আমার কাছে কিছু চায়, আমি তা তাকে দান করি। যদি সে আমাকে ডাক দেয়, আমি তাকে সাড়া দেই।

আমি কোনো কাজ করতে গিয়ে এতটা দোদুল্যমান হই না, যতটা আমি দ্বিধাগ্রস্ত হই একজন মুমিনের মৃত্যু নিয়ে, কারণ সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আর আমি তাকে কষ্ট দিতে অপছন্দ করি।[৭]

হাদীস-৩

ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন,

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: يُبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ، قَالَ: وَمَا سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

إِنَّ الْيَسِيرَ مِنَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، وَإِنَّ مَنْ عَادَى وَلِيَ اللَّهِ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ تَعَالَى بِالْمُحَارَبَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ الَّذِينَ إِنْ غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُعْرَفُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وقال الذهبي: صحيح

যাইদ ইবন আসলামের পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে বের হয়ে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন, হযরত মুআয ইবন জাবাল (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন।

উমর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুআয! তুমি কাঁদছো কেন?

তিনি বললেন, আমি এমন একটি কথা শুনেছি এই কবরের অধিকারীর (রাসূলুল্লাহ ﷺ) কাছ থেকে, যা আমাকে কাঁদাচ্ছে।

উমর (রা.) বললেন, তুমি কী শুনেছো?

তিনি বললেন, অল্প পরিমাণ রিয়াও (লোক দেখানো ইবাদত) শিরক। আর যে কেউ আল্লাহর কোনো ওলীর বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে,সে আল্লাহর সাথে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করে।

আর আল্লাহ ভালোবাসেন সেসব তাকওয়াবান, গোপন সাধক বান্দাদের যারা অনুপস্থিত থাকলে কাউকে খেয়াল হয় না, আর উপস্থিত থাকলেও কাউকে ডাকা হয় না বা কেউ চেনে না। তাদের হৃদয় হয় হিদায়াতের দ্বীপশিখা, তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন ধুলিময় সমাজ থেকে আলোর পথে বেরিয়ে আসেন।[৮]

---

[১] সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস-৪১০০।
[২] হাফিয আবূ নাঈম, ওফাত ৪৩০ হি, হিলয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০
[৩] আবুল ইজ্জ দিমাশকী (ওফাত ৭৯২ হি.), শারহুল আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৬৯, আর-রিসালাহ, ১৯৯০ইং।
[৪]. ইমাম যাহাবী (ওফাত ৭৪৮ হি.), সিয়ার আলামিন নুবালা।
[৫]. ইবনু খালদূন, ওফাত ৮০৮ হি., তারিখে ইবনে খালদূন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬১১।
[৬]. বুখারী, হাদীস-৬৫০২
[৭]. মুসনাদ ইমাম আহমাদ, হাদীস-২৬১৯৩
[৮]. ইমাম হাকিম, আল মুস্তাদরাক, হাদীস-৭৯৩৩

Al Arab Tailors
মো. আনোয়ার হোসেন
প্রোপ্রাইটর
আল আরব টেইলার্স
পাঞ্জাবী স্পেশালিস্ট
১১৮, করিম উল্লাহ মার্কেট (নিচ তলা)
বন্দর বাজার, সিলেট
01734-346601

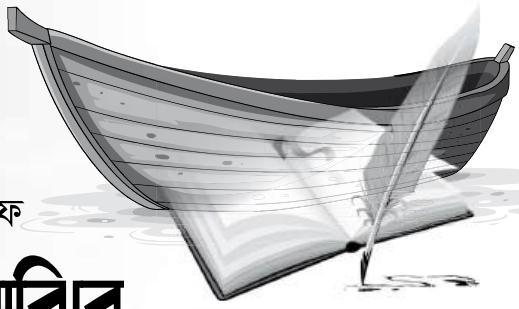

মাওলানা রূমীর মসনবী শরীফ

ব্যাকরণবিদ ও নৌকার মাঝির বিতর্কে জীবনের রহস্য

ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

ব্যাকরণবিদ ও নৌকার মাঝির বিতর্ক মসনবী শরীফের অন্যতম প্রসিদ্ধ গল্প। আরবী ব্যাকরণবিদকে বলা হয় নাহবী। আরবী পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভাষা। পৃথিবীর সবচে প্রাচীন, সমৃদ্ধ ও জটিল এ ভাষা একেবারে সহজ মনে হবে, যদি ব্যাকরণের মারপ্যাঁচগুলো রপ্ত থাকে। বিষয়টি অঙ্ক শেখার আগে বিশ পর্যন্ত নামতা মুখস্থ করার মতো। বাংলায় করেছি, করছি, করছে শব্দে 'া' বা 'ি' কারের পরিবর্তনে অর্থের তারতম্য লক্ষ্যনীয়। আরবীতেও শব্দের শরীর গঠনে তারতম্য বা শেষে যের যবর পেশ প্রভৃতি মাত্রার সামান্য হেরফেরে অর্থের বিস্তর ব্যবধান হয়। আরবী ভাষায় ব্যাকরণের এসব হেরফের যারা জানেন তাদের বলা হয় 'নাহবি' ব্যাকরণবিদ। নাহবী মনে করেন, কুরআন হাদীসের মর্ম উদঘাটনের রসায়ন তাদের রপ্ত। এ নিয়ে তাদের যত অহংকার।

এক নাহবী একদিন নৌকায় চড়েছেন, কোথাও যাবেন। মাঝি চলল বৈঠায় ছন্দ তুলে সারি গান গেয়ে। নাহবীর জ্ঞানের অহমিকা তখন তর সয় না। বলল, রে মাঝি! জি জনাব–গানের রেশ টেনে জবাব দেয় মাঝি। আচ্ছা, ব্যাকরণের ঐ নিয়মটা কি তুমি জানো? বিনয়ের সাথে মাঝি বলল, জি না। নাহবী ব্যাকরণের আরো দু'একটি মারপ্যাঁচ জিজ্ঞাসা করল। মাঝির একটাই কথা, উম্মী মানুষ, এসব কি আমার জানা? নাহবী তার জ্ঞানের অহমিকায় ডগমগ। বলল, মাঝি! এসব জানো না, তো তোমার জীবনটাই আট আনা মিছে। মাঝি লজ্জায় নিশ্চুপ। এতবড় পণ্ডিতের সামনে কিছু বলার সাহস তার কোথায়। আজকের ছেলেমেয়েরা হয়তো চার আনা, আট আনা, বারো আনা বুঝবে না। তাই বলছি, এখনকার হিসেবে ১০০ পয়সায় এক টাকা। আমাদের ছোটবেলায় এক টাকা হিসাব করা হত ষোল আনায়। সে হিসেবে কোনো বিষয়ের চার ভাগের এক ভাগ, অর্ধেক বা তিন চতুর্থাংশ বুঝাতে কথায় কথায় আনার উদাহরণ আনা হত। নাহবী আরো একটি প্রশ্ন করে মাঝিকে জব্দ করে, সারাজীবন নদীর পানিতে গতর খেটে যাচ্ছ অথচ এসব জ্ঞান তোমার নেই, জীবন তোমার বারো আনা মিছে।

নৌকা তখন মাঝ দরিয়ায়। হঠাৎ ঈশানকোণে কালো মেঘ দেখা দিল, বাতাসের বেগে দুলে উঠল নৌকা। এক ঘূর্ণাবর্তে গিয়ে মুচড় দিল নৌকা। এবার মাঝি নাহবীকে জিজ্ঞেস করে, মশাই! এখন তো বিপদ। যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, নৌকা ডুবে যেতে পারে। আপনি কি সাঁতার জানেন? ভয়ে জড়সড়ো নাহবী জানায়, না মাঝি, আমার তো সাঁতার জানা নেই। মাঝি এবার বলল, আসলে আপনার জীবনটাই ষোল আনা মিছে।

گفت کلی عمرت ای نحوی فناست
زآنکه کشتی غرق این گردابهاست

গোফত কুল্লি ওমরাত আই নাহবি ফানা'স্ত
যাঁকে কেশতি গারকে ইন গারকা'বহা'স্ত
বলল, নাহবী জীবন তোমার পুরোটাই তো মিছে
নৌকা এখন ডুবে যায় দেখুন প্রবল ঘূর্ণিপাকে।

মাওলানা রূমী এই গল্পের অবতারণা করে বলতে চান, যারা এই জগতে দম্ভ অহংকারে অন্ধ, যারা ইহকালীন জীবন নিয়ে মহাব্যস্ত, সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী লোকদের কষ্টের জীবন দেখে যারা উপহাস করে, তারাই মূর্খ। তাদের জীবনই ষোল আনা মিছে। পরকালের কঠিন পারাপার পার হওয়ার, মাঝ দরিয়ার ঘূর্ণাবর্ত অতিক্রম করার সাঁতার তাদের জানা নেই। এ জন্যে মাওলানার উপদেশ:

نحو می باید نه نحو اینجا بدان
گر تو نحوی بی خطر زر آب ران.

মাহ্‌ব মী বা'য়াদ না নাহ্‌ব ইঞ্জা বেদা'ন
গর তো মাহবি বী খতর দর আ'ব রা'ন
ব্যাকরণ নয় এখানে প্রয়োজন আত্মবিলীনের রসায়ন
আত্মবিলীন হতে পারো তো নির্ভয়ে চালাও নৌযান।

কথায় বলে অতি চালাকের গলায় দড়ি। দুনিয়াকে ভোগ করার জন্য তোমার চালাকির শেষ নাই, নিজেকে মনে কর সবচে বুদ্ধিমান। কিন্তু জীবনের সাগর পাড়ি দিতে তুমি মাঝপথে হবে নিমজ্জমান। পক্ষান্তরে যারা অহংকারমুক্ত, মনে করে অনেক কিছুই আমার আয়ত্তে নাই তারা দুনিয়ার হিসেবে মৃত, আত্মবিলীন। সাত সাগর পাড়ি দিতে এরাই হয় সফলকাম। একটি উপমা লক্ষ্য করো।

آب دریا مردہ را بر سر نہد
ور بود زندہ ز دریا کی رہد
আ'বে দরয়া' মুর্দা রা' বর সার নাহদ
ওয়ার বুয়াদ যেন্দা যে দরয়া' কেই নাহাদ
সাগরের পানি ভাসিয়ে তোলে মুর্দার লাশ
আর যে জীবন্ত তলিয়ে যায় সে সাগরের গ্রাস।

মাওলানা বুঝিয়ে বলছেন, তুমি জ্ঞান পাণ্ডিত্য অর্জন করেছ ভালো কথা। অহংকারে বেসামাল হইও না। মেধা, যোগ্যতা, মানবীয় যশঃখ্যাতি অর্জন করেছ, বিনয়ী হয়ে যাও। নচেৎ আল্লাহর পরিচয়, জীবন ও জগতের তত্ত্বজ্ঞান হতে বঞ্চিত থেকে যাবে। তোমার অস্তিত্বের পুষ্করিণী তখন ময়লা আবর্জনায় ভরে যাবে। এ অবস্থায় আল্লাহর পরিচয় লাভের আবে হায়াত, অমৃত সুধা সেখানে প্রবেশ করবে না। আর যদি মানবসুলভ গুণবৈশিষ্ট্যের অহমিকা হতে মুক্ত হতে পার, তাহলে জগৎ ও জীবনের রহস্য তোমার কাছে উন্মোচিত হবে।

چون بمردی تو ز اوصاف بشر
بحر اسرارت نہد بر فرق سر.
চোন বেমোদী তো যে আউসা'ফে বশর
বাহরে আসরারত নেহাদ বর ফারক সর
যদি মরে যাও তুমি মানবসুলভ স্বভাব-বৈশিষ্ট্য হতে
রহস্যের সাগর ভাসিয়ে তোমায় তুলবে নিজের বুকে।

গল্পের নাহবী বা ব্যাকরণবিদ বলতে মাওলানা এখানে সকল জ্ঞানী পণ্ডিতদের বুঝিয়েছেন। যারা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধির অহমিকায় অন্যদের আহম্মক বলে মনে করে।

گر تو علامۂ زمانی در جہان
نک فنای این جہان بین وین زمان.
গর তো আল্লামায় যমা'নী দর জাহা'ন
নেক ফানা'য়ে ইন জাহা'ন বিন ওয়ীন যমা'ন
তুমি যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগর বুঝলাম আল্লামা বিজ্ঞজন,
দেখ এই জগৎ কত অস্তিত্বহীন, ক্ষণিকের জীবন।

মাওলানা বলতে চান, প্রকৃত বিদ্যাসাগর তিনি যিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখেন যে, এই জগৎ প্রকৃত অনস্তিত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এর অর্থ, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই জাতীয় কথা মুখে উচ্চারণ করা নয়। কারণ, অনেকে আছেন এসব বুলি আওড়িয়ে নিজেরা দুনিয়া শিকারে ব্যস্ত। এ জাতীয় লোকদের দিব্যচক্ষু খুলে দেওয়ার জন্য মাওলানা রূমীর জীবনের একটি ঘটনা লিখেছেন মওলানার জীবনীকার আফলাকী।

দু'জন আলিম একদিন মাওলানা রূমীর মজলিসে উপস্থিত হল পরস্পর বুদ্ধি করে। তারা মাওলানার তাসাওউফ চর্চার বিরোধী। মাওলানার জ্ঞানের পরীক্ষা নেবেন, সুযোগ বুঝে জব্দ করবেন, এই চিন্তা ছিল তাদের মাথায়। মাওলানা তার বয়ানে অপর দু'জন আলিমের প্রসঙ্গ আনলেন। এক নাহবী ও আরেক ফকীহ একসাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। উভয়ে পথ চলতে গিয়ে হঠাৎ এক পরিত্যক্ত কুয়ার দ্বারে উপস্থিত। আইনশাস্ত্রবিদ ফকীহ বললেন, বির মুআত্তালা (পরিত্যক্ত কূপ)। নাহবী প্রতিবাদ করলেন। কী বলেন, বির নয়, শব্দটির উচ্চারণ বি'র, মাঝখানে হামযা দিয়ে। ফকীহ নানা যুক্তি দিলেন হামযার পরিবর্তে ইয়া উচ্চারণের পক্ষে। নাহবীর কথার তিনি পাত্তা দিলেন না। নাহবীও নাছোড়বান্দা। এমন ভুল উচ্চারণ করতে পারেন না ফকীহ। তিনি ব্যাকরণের কী জানেন। শুরু হল বচসা। প্রত্যেকে নিজের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দেন। অপরপক্ষ তা খণ্ডন করেন। কেউ হারে নাহি জিতে সমানে সমান। তর্কের ঘোরে তারা পথ চলছিলেন গন্তব্যহীন। সামনে কোনো শহর বা জনপদ দৃশ্যমান নয়। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। আঁধারের চাদরে চারদিক ছেয়ে গেল। অন্ধকারে মেঠোপথ, গা ছমছম পথচলা। হঠাৎ পা পিছলে নাহবী পড়ে গেলেন একটি কুয়ায়। আগেকার দিনের কুয়া থেকে নিজের চেষ্টায় উঠে আসার উপায় নেই। এখন মরা বাঁচার প্রশ্ন। সাথি ফকীহ যদি এ অবস্থায় ফেলে চলে যান, তাহলে রাতে কুয়ার গহীনে রাত যাপন কিংবা মরণ। অগত্যা বন্ধু ফকীহকে বললেন, বন্ধু! পথচলার সাথি! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বাঁচান। অন্ধকার কূপে আমাকে ফেলে চলে যাবেন না। ফকীহ বলল, যতক্ষণ বির উচ্চারণ স্বীকার না করবেন, কূপ থেকে তুলব না। অহংকারী নাহবী বুঝতে পারল, নিজের অসহায়ত্ব। বলল, মেনে নিলাম বির। মাঝখানে হামযা বাদ দিয়ে ইয়ার উচ্চারণ সঠিক মানলাম।

মাওলানা বলছেন, শব্দের মারপ্যাঁচ নয়, শব্দের ভেতরের অর্থের সন্ধান কর। ওহে জ্ঞানের অহমিকায় প্রতারিত।

তখনকার দিনে জ্ঞানের বাহাদুরি ছিল ধর্মীয় জ্ঞান নিয়ে। এখন জ্ঞানের নানা শাখার বিস্তার হওয়ায় যারা দুনিয়াবী জ্ঞানের বিজ্ঞানী পণ্ডিত তারা ধর্মীয় জ্ঞানচর্চায় নিরত লোকদের মনে করে দুনিয়ার উন্নতি অগ্রগতি থেকে পিছিয়ে এরা আহম্মক। অর্থ রোজগারের এত পথ খোলা, অথচ হালাল হারামের প্রশ্ন তুলে এরা জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হতে বঞ্চিত।

মাওলানা বলেন, হে জ্ঞানী! তোমার আমিত্ব, আত্মপূজার প্রতিমা ধ্বংস করো। তাহলেই তোমার দিব্যচক্ষু খুলে যাবে। নফস ও কামনার অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার তুমি উপায় খুঁজে পাবে। ◘

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগে
প্রশ্ন করুন

"ঈমান, আমাল ও আকীদা বিষয়ক আপনার যেকোনো প্রশ্ন আজই পরওয়ানার অনুকূলে পাঠিয়ে দিন।???

প্রশ্ন করার নিয়ম
- শুধুমাত্র প্রশ্নের মূল কথাগুলো লিখে পাঠাতে হবে
- ই-মেইল অথবা ডাকযোগে প্রশ্ন পাঠাতে পারবেন

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা
অফিস: ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা, ৩৩৪/৪এ, দক্ষিণ গোড়ান, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
সিলেট বিভাগীয় অফিস: পরওয়ানা ভবন-৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট
E-mail: parwanabd@gmail.com

এই মাসে এই চাঁদে



পরওয়ানা ডেস্ক:

হুদাইবিয়ার সন্ধি : চুক্তির আড়ালে সুস্পষ্ট বিজয়

মহান আল্লাহ তাআলার ইঙ্গিত পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে উমরাহ পালনের জন্য মনস্থির করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, কুরাইশরা তাকে শান্তিপূর্ণভাবে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। তবু পরিস্থিতি যেমনই হোক মক্কা যাওয়ার এই সিদ্ধান্তে তিনি অটল। প্রায় চৌদ্দশত সাহাবী নিয়ে উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে মক্কার অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। খবর পেয়ে মক্কার কুরাইশগণ মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। মক্কার কাছাকাছি উসফান নামক স্থানে পৌঁছানোর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর পেলেন কুরাইশদের একটি সৈন্যদল কুরাউল গামীম উপত্যকায় এসেছে মুসলিমদের প্রতিহত করার জন্য। তিনি তখন মুসলমানদের নিয়ে অন্য পথে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। হুদাইবিয়া নামক স্থানে কাফেলার যাত্রাবিরতি দেওয়া হলো। এদিকে কুরাইশরা কঠোর অবস্থান নিয়েছে কোনোভাবেই মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। এমন উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে খুযাআ গোত্রের নেতা বুদাইল ইবন ওয়ারাকা কয়েকজন লোক নিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাধ্যমে কুরাইশদের নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, মুসলমানরা মক্কায় উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে; কোনো যুদ্ধের জন্য নয়। বুদাইল মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের কাছে এই কথা জানালে কিছু কুরাইশ নেতা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায়। অন্যদিকে কুরাইশদের কিছু বিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝতে পারলো যে, মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যদি উমরাহ পালন করতে দেয়া না হয় তাহলে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। তাছাড়া, মক্কার কুরাইশগণ সিরিয়ার সাথে তাদের বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখতে হলে মুসলমানদের সাথে চুক্তি করতেই হবে, কেননা মদিনার উপর দিয়ে যাওয়া এই বাণিজ্য পথটি মুসলমানদের দখলে রয়েছে। অত:পর, কুরাইশগণ উরওয়া ইবন মাসউদকে সন্ধির শর্ত নির্ধারণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রেরণ করলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের সম্পর্কে উরওয়া ইবন মাসউদ এর অপ্রীতিকর ও শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবের কারণে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। তবে, সে মক্কায় ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সাহাবীদের ভক্তি, ভালোবাসা ও আস্থার কথা কুরাইশদেরকে অবহিত করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার খিরাস ইবন উমাইয়া নামক একজন দূতকে কুরাইশদের নিকট পাঠালেন, কিন্তু কুরাইশগণ তার সাথে দুর্ব্যবহার করে। তার উটের পায়ের রগ কেটে দেয়, এমনকি মুসলমানদের হত্যা করার জন্য একটি ক্ষুদ্র দলকেও পাঠায়। তারা আক্রমণ করতে এসে মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং পবিত্র কাবা ঘরের আওতার মধ্যে রক্তপাত করতে নিষেধ করেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান (রা.) এর প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা চিন্তা করে আলোচনার জন্য তাকে কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করলেন। মক্কায় গিয়ে উসমান (রা.) কুরাইশ নেতাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বার্তা পৌঁছে দেন। কুরাইশগণ উসমান (রা.) এর সাথে দীর্ঘসময় কথা বলে এবং কোনো কারণে তিনি মক্কায় বেশিক্ষণ সময় ব্যয় করেন। ফলে মুসলিম শিবিরে গুজব রটে যে, কুরাইশরা উসমান (রা.)-কে হত্যা করেছে। এই খবর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই মর্মাহত হলেন। তিনি সাহাবীদের একত্রিত করে একটি গাছের নিচে এই শপথ নেন যে, ইসলাম ও ঈমানের জন্য তাঁরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করবেন। ইতিহাসে এই শপথকে 'বাইআতুর রিদওয়ান' বলা হয়। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন- মুমিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বাইআত গ্রহণ করলো তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাদের অন্তরে যা ছিল, তা সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়। (সূরা ফাতহ, আয়াত: ১৮) শপথ গ্রহণ শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে হযরত উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে নিজে শপথ নিলেন। পরে অবশ্য হযরত উসমান (রা.) নিরাপদেই মুসলিম শিবিরে ফিরে আসেন। কুরাইশগণ বুঝতে পারলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একান্ত অনুগত ও অপ্রতিরোধ্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা সফলকাম হতে পারবে না। কেননা অতীতের শোচনীয় পরাজয়ের স্মৃতি তখনো তাদের মনে স্পষ্টভাবে গেঁথে আছে। তাই তারা সন্ধি করার জন্য সুহাইল ইবন আমরকে মুসলমানদের নিকট দূত হিসেবে পাঠালো। তার সঙ্গে দীর্ঘ সময়ব্যাপী আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয় এবং একটি সন্ধির শর্তাবলী স্থিরীকৃত হয়। এটিই ইসলামের ইতিহাসে 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' নামে খ্যাত। সন্ধিপত্রে যখন হযরত আলী (রা.) লিখলেন 'এই সন্ধি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরফ থেকে' তখন কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইল ইবন আমর প্রতিবাদ জানিয়ে বললো, 'আল্লাহর রাসূল' কথাটি লেখা যাবে না; এ ব্যাপারে আমাদের আপত্তি আছে। একথা শুনে সাহাবীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হলো। হযরত আলী (রা.) কিছুতেই এটা মানতে রাযি হলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সার্বিক দিক বিবেচনা করে সুহাইলের দাবি মেনে নিলেন এবং নিজের হাতে 'আল্লাহর রাসূল' কথাটি কেটে দিয়ে বললেন, তোমরা না মানো, তাতে কি? খোদার কসম, আমি আল্লাহর রাসূল।' সন্ধির কয়েকটি শর্ত ছিলো নিম্নরূপঃ-

- মদিনার মুসলমানগণ ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত সকল প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকবে।
- এ বছর মুসলমানরা উমরাহ পালন না করেই মদিনায় ফিরে যাবে।
- আগামী বছর মুসলমানগণ মক্কায় আসতে পারবেন। কিন্তু তিনদিনের বেশি সময় মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন না।
- এসময় তারা কোনো অস্ত্র সঙ্গে আনতে পারবে না। তবে আত্মরক্ষার জন্য কেবলমাত্র কোষবদ্ধ তরবারী সঙ্গে রাখতে পারবেন।
- এই দশ বছরের মধ্যে যদি কোনো মক্কাবাসী মদিনায় চলে যায় তবে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে, কিন্তু যদি কোনো মুসলমান মক্কায় আসে তবে মক্কাবাসীরা তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না

স্বাভাবিকভাবেই সাহাবীগণ এই চুক্তির শর্তাবলীতে খুশি হতে পারেননি। কারণ, চুক্তির শর্তগুলো ছিল একতরফা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাতের দাওয়াত ও সুকৌশল রাজনীতির জন্য হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শত্রুগণ সন্ধির মাধ্যমে ভবিষ্যতে দশ বছর যুদ্ধ বিগ্রহ না করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমেই মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর ঘর কাবা যিয়ারত করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের সুমহান বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আমর ইবনুল আস, খালিদ বিন ওয়ালিদ, উসমান বিন তালহাসহ বড় বড় যোদ্ধা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সন্ধির ধারাগুলো আপাতদৃষ্টিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গিয়েছে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এই সন্ধির ফলেই মক্কা বিজয়ের পথ সুগম হয়। যা বিশ্বজয়ের সূচনা করে। হুদাইবিয়ার সন্ধি ইসলামের জন্য একটি মহান বিজয়। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে হুদাইবিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবীন' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।



জবাব দিচ্ছেন-
মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার
প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার
মিশিগান, আমেরিকা

প্রশ্ন: চুল রাখার সুন্নত তরীকা কী এবং বাবরি চুল রাখার কি কোনো নির্দিষ্ট বয়স আছে? বিস্তারিত জানতে চাই।

জবাব: রাসূল ﷺ সর্বদা বাবরী রেখেছেন। তাই পুরুষের চুল রাখার ক্ষেত্রে বাবরী রাখা রাসূল ﷺ এর সুন্নত।

তাছাড়া ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ চুল মুণ্ডাতেন। এ সময় তিনি মাথা মুণ্ডানোকে চুল ছোট করে রাখার উপর প্রাধান্য দিতেন । এজন্য ইমাম তাহাবী (র.) এ পদ্ধতিকে সুন্নাত পদ্ধতির মধ্যে পরিগণিত করেছেন। অবশ্য মাথার সবদিকে সামঞ্জস্য রেখে চুল ছোট রাখা জায়িয যা সাহাবায়ে কিরামের আমল থেকে প্রমাণিত। আর কিছু অংশ মুণ্ডানো ও কিছু রেখে দেওয়া নিষেধ। কেননা হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এসেছে-

عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع» قال: قلت لنافع وما القزع قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض

-হযরত ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ 'কাযা' করতে নিষেধ করেছেন। 'কাযা' বলা হয়, বাচ্চার মাথার একাংশ কামিয়ে ফেলা, আরেকাংশের চুল না কামানো। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-২১২০)

তাছাড়া বিজাতীয়দের বিশেষ অনুকরণে যে সকল পদ্ধতিতে চুল কাটা হয়ে থাকে সেগুলো নাজায়িয।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে তিন পদ্ধতির বাবরী রাখতেন তার বর্ণনা হাদীস গ্রন্থাবলীতে বিভিন্ন সনদে এসেছে। উক্ত পদ্ধতিসমূহের নাম, ১) ওয়াফরা তথা কানের লতি পর্যন্ত চুল।

২) লিম্মা তথা গর্দান ও কানের লতির মাঝামাঝি বরাবর রাখা। ৩) জুম্মা তথা ঘাড় পর্যন্ত প্রলম্বিত চুল।

সহীহ বুখারী গ্রন্থের এক বর্ণনায় এসেছে-

حدثنا أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চুল মুবারক ঘাড় পর্যন্ত লম্বা ছিল। (হাদীস-৫৯০৩)

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে-

عن أنس، قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চুল মুবারক কানের মাঝামাঝি পর্যন্ত লম্বা ছিল। (হাদীস-২৩৩৮)

সুনান ইবন মাজাহ গ্রন্থের হাদীসে এসেছে-

عن عائشة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة، وفوق الوفرة

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চুল মুবারক কাধের উপর এবং কানের নিচ পর্যন্ত লম্বা ছিল। (হাদীস-৩৬৩৫)

হারুন মিয়া
মিশিগান, আমেরিকা

প্রশ্ন: উমরাহ এর প্রয়োজনীয় কার্যাবলী তথা তাওয়াফ ও সাঈ সম্পন্ন করার পর কেউ মাথামুণ্ডন কিংবা মাথার চুল কর্তন না করে ভুলবশতঃ ইহরাম খুলে ফেলেছে এবং স্ত্রী সহবাস করেছে, অতঃপর মাথা মুণ্ডনের বিষয় (বাদ পড়েছে বলে) স্মরণ হলে তার জন্য করণীয় কী?

জবাব: উমরাহ এর প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদনের পর ইহরাম থেকে বের হওয়ার জন্যে মাথা মুণ্ডন কিংবা মাথার চুল ছাঁটা ওয়াজিব। তা ছেড়ে দিলে এবং ইহরাম অবস্হায় নিষিদ্ধ কার্যাবলীর যে কোনটি; যেমন- আতর ব্যবহার, নখ কাটা, স্ত্রী সহবাস, পুরুষের জন্য একদিন কিংবা এক রাত্রি বা ততোধিক পরিমাণ সময় মাথা ঢাকা কিংবা সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা এসকল কার্যাদির কোন একটি করার পরে (মাথা মুণ্ডন ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি) স্মরণ হলে সঙ্গে সঙ্গে মাথামুণ্ডন কিংবা মাথার চুল কর্তন করে নিবে এবং কাফফারা হিসেবে হারামের সীমানায় একটি ছাগল দম হিসেবে যবেহ করে দিতে হবে। এ সম্পর্কে আল বিনায়াহ শারহুল হিদায়াহ কিতাবে লিখেছেন-

وإذا جامع بعدما طاف أربعة أشواط أو أكثر فعليه شاة ولا تفسد عمرته وكذا بعد السعي قبل الحلق لبقاء إحرام العمرة، ذكره في "المحيط"

-চার চক্কর কিংবা ততোধিক তাওয়াফ সম্পাদনের পর কেউ স্ত্রী সহবাস করলে তার উমরাহ নষ্ট হবে না, তবে তার উপর একটি ছাগল দম হিসেবে আবশ্যক হবে। অনুরূপ সাঈ সম্পাদনের পর হলকের (মাথা মুণ্ডনের) পূর্বে স্ত্রী সহবাসের একই বিধান, কেননা উমরাহ এর ইহরাম তখনও অবশিষ্ট রয়েছে। মুহীত কিতাবে তা (গ্রন্থকার) উল্লেখ করেছেন। (আল বিনায়াহ শারহুল হিদায়াহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৩)

সুমাইয়া জান্নাত
জকিগঞ্জ, সিলেট

প্রশ্ন: হাদীসে আছে মাটি খাওয়া হারাম। কিন্তু সিলেট অঞ্চলের অনেক মানুষ ছিকর (কালো মাটি) মাটি দিয়ে বিস্কুটের মতো বানিয়ে খায়। এটা খাওয়া কি জায়িয?

জবাব: মাটি খাওয়া হারাম হওয়া সম্পর্কীয় হাদীস দুর্বল। এর দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত করা যায় না। তাই মাটি খাওয়ার বিধান বিষয়ে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের অভিমত হচ্ছে- মাটি মানুষের স্বাস্থ্যগত ক্ষতির কারণ হলে খাওয়া নিষিদ্ধ বা হারাম হবে নতুবা হারাম নয়। সুতরাং উপরোক্ত 'ছিকর' নামক কালো মাটি খাওয়ার বিধান বর্ণিত নীতিমালার ভিত্তিতে হারাম বা হালাল হওয়া সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার আলোকে যদি একথা জানা যায় যে, তা শারীরিক ক্ষতির কারণ, তাহলে হারাম হবে, নতুবা হালাল।

এ সম্পর্কে ফকীহগণের অভিমত নিম্নরূপ-
ইমাম সুবুকী বলেছেন,

وقال السبكي: لا يحرم أكل الطين؛ لأنه لم يصح فيه حديث؛ إلا أن يضر بكثرته، فيحرم" انتهى. (باب الربا شرح المنهاج)

-ইমাম সুবুকী বলেছেন, মাটি খাওয়া হারাম নয়। কেননা এ বিষয়ের কোন হাদীস সহীহ নয়। তবে বেশি খাওয়ার কারণে কারো ক্ষতির কারণ হলে তা হারাম হবে।

এ সম্পর্কে আল মুহিতুল বুরহানী কিতাবে লিখেছেন,

أكل الطين مكروه هكذا في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله، وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه إذا كان يخاف على نفسه أنه لو أكله أورثه ذلك علة أو آفة؛ لا

يباح له التناول، وكذلك هذا في كل شيء سوى الطين، وإن كان يتناول منه قليلا، وكان يفعل ذلك أحيانا لا بأس به

-মাটি খাওয়া মাকরূহ। আবুল লাইস (র.) এর ফাতাওয়া গ্রন্থে অনুরূপ রয়েছে । শামসুল আইম্মা আল হালওয়ানী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, যদি কেউ এ আশংকা করে যে, মাটি খেলে এর দ্বারা সে অসুস্থ হবে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাহলে তার জন্য খাওয়া বৈধ হবে না। মাটি ব্যতীত অন্য সকল জিনিসের ব্যাপারও তদ্রুপ যদিও সামান্য খাওয়া হয়। আর কখনো কখনো তা খাওয়া ক্ষতিকারক হয় না। (আল মুহিতুল বুরহানী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৩)

শামীম আহমদ
সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসা

প্রশ্ন-১: কোন মুসলমান ছেলে খ্রিষ্টান মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে কি?

জবাব: ইসলাম ধর্ম সরাসরি মুশরিক কিংবা কাফির যে কোন সম্প্রদায়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে যেমন রায় দিয়েছে, তদ্রুপ শর্ত সাপেক্ষে আহলুল কিতাব তথা ইয়াহুদী- খ্রিষ্টান নারীকে বিবাহ করা বৈধ বলেও রায় দিয়েছে। তাই যে সকল শর্ত এ ক্ষেত্রে আরোপ করা হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্তাবলি হলো- ১) প্রকৃত আহলুল কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়া তথা ওহী, রিসালাত ও পরকালের মৌলিক বিশ্বাসে বিশুদ্ধ আকীদা পোষণকারী হওয়া এবং ২) সচ্চরিত্র ও পবিত্রতম জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া। কেউ বর্ণিত গুণাবলিসম্পন্ন হলে পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় সে আহলুল কিতাব (ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান) বিবেচিত হবে।

আহলুল কিতাব নারীকে বিবাহের ক্ষেত্রে আরেকটি শর্ত হচ্ছে- ৩) সে নারী মুসলমানের রাষ্ট্রে বসবাসকারী হওয়া। যদি সে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী হয় তবে কোন কোন ফকীহগণের অভিমত অনুযায়ী তাকে বিবাহ করা হারাম। তবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মাকরূহে তাহরীমী।

এখনকার বেশিরভাগ আহলুল কিতাব বর্ণিত গুণাবলিসম্পন্ন না হওয়ায় এমনকি তাদের অধিকাংশ দাহরীয়া প্রকৃতির নাস্তিকতার চিন্তা চেতনা পোষণ করায় এবং চরিত্রগত দিক থেকে বেহায়াপনা ও অনৈতিকতায় অগ্রগামী হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বর্তমান সময়ে এরুপ মেয়েকে মুসলমান ছেলে বিবাহ করা মোটেও জায়িয নয়। যেহেতু এতে নানাবিধ ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা রয়েছে, যেমন- নিজের মধ্যে তাদের প্রভাব প্রতিফলিত হওয়া কিংবা সন্তানাদি অনুরূপ প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া বা মুসলমানের ক্ষতি সাধনে গুপ্তচর হয়ে ক্ষতি সাধনের হীন উদ্দেশ্য জড়িত থাকা।

এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত শাকীক ইবন সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত হুযাইফা ইবন ইয়ামান (রা.) মাদাইনে একজন ইয়াহুদী নারীকে বিবাহ করলেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) উক্ত বিষয়ে অবহিত হলে তাকে পত্র মারফত উক্ত নারীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ করলেন। জবাবে যখন তিনি জানতে চাইলেন, তাকে বিবাহ করা কি আমার জন্যে হারাম? তখন এর জবাবে হযরত উমর (রা.) জানালেন, আমি হারাম বলি না, তবে তাদের মধ্যে ব্যাপকহারে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও লজ্জাশীলতার অভাব। তাই আমি এ ব্যাপারে আশংকা করি যে অনায়াসে তাদের অপবিত্রতা ও নির্লজ্জতা আপনাদের পরিবার গুলোতে বিস্তার লাভ করবে। (আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৩)

ইমাম মুহাম্মদ (র.) হযরত উমর (রা.) এর উক্ত বাণী উল্লেখপূর্বক আহলুল কিতাব নারীকে বিবাহ করা মাকরূহ সাব্যস্ত করে রায় দিয়েছেন। (কিতাবুল আসার, পৃষ্ঠা ১৫৬)

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) তদ্বীয় কিতাবে একথা উল্লেখ করেছেন যে, হযরত উমর (রা.) আহলুল কিতাব নারীকে বিবাহের বিষয়ে হযরত তালহা (রা.) ও হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা.) কে কঠোরভাবে সতর্ক করে তালাক প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। (ফাতহুল কাদীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩০)

প্রশ্ন-২: পিতা-মাতার একজন মুসলমান ও অন্যজন খ্রিষ্টান হলে এবং তাদের কোনো সন্তানের জন্ম হলে উক্ত সন্তান মুসলমান বলে গণ্য হবে নাকি খ্রিষ্টান? জানতে চাই।

জবাব: কোন সন্তানের পিতা-মাতার প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুসারী হলে সন্তানকে দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে পিতা ও মাতার মধ্যে যার ধর্ম উত্তম হবে তার ধর্মের আওতাভুক্ত বিবেচনা করা হবে। তাই পিতা ও মাতার যেকোন একজন মুসলমান হলে সন্তান মুসলমান বলে পরিগণিত হবে। এ সম্পর্কে আল্লামা মুল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন-

وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَلَدَ تَابِعٌ لِأَشْرَفِ الْأَبَوَيْنِ دِينًا فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى أُمُورِ الدُّنْيَا، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ، وَأَمَّا فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى أُمُورِ الْآخِرَةِ فِي الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فَمَوْقُوفٌ مَوْكُولٌ إِلَى عِلْمِ اللهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ السَّعَادَةَ وَالشَّقَاوَةَ لَيْسَتَا مُعَلَّلَتَيْنِ عِنْدَنَا بِالْأَعْمَالِ، بَلِ اللهُ تَعَالَى خَلَقَ مَنْ شَاءَ شَقِيًّا، وَمَنْ شَاءَ سَعِيدًا، وَجَعَلَ الْأَعْمَالَ دَلِيلًا عَلَى السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ. (قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)

-জ্ঞাতব্য যে, সন্তান তার পিতা ও মাতার মধ্যে যার ধর্ম উত্তম তার অনুগামী বিবেচিত হবে পার্থিব বিষয়াবলির ক্ষেত্রে। আর পরকালীন অবস্থা তথা পুরস্কার কিংবা শাস্তি আল্লাহর ইলমের উপর নির্ধারিত হবে। বিষয় দুটির আলোচনা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিম্নোক্ত দুটি বাণীতে বর্ণিত হয়েছে- الله اعلم بما كانوا عاملين و هم من آباءهم (মিরকাতুল মাফাতীহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৭; باب الايمان بالقدر)

সাইফুল ইসলাম
ছাতক, সুনামগঞ্জ

প্রশ্ন: নামাযে হাত দিয়ে কয়বার চুলকালে নামায বাতিল হবে?

জবাব: নামাযের যেকোন রুকুনে কেহ 'আমলে কাসীর' করলে ফকীহগণের ঐক্যমতে নামায ফাসিদ হয়ে যায়। তবে আমলে কাসীর এর ব্যাখ্যায় বহু অভিমত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি অভিমত হচ্ছে নামাযের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোন কাজ কোন এক রুকুনে তিনবার বা ততোধিক করা। তাই তিনবার বা ততোধিক সংখ্যক চুলকানি কোন এক রুকুনে হলে ফুকাহাগণের অনেকের মতে নামায ফাসিদ হবে।

ثم اختلف المشايخ في الحد الفاصل بين العمل اليسير وبين العمل الكثير، بعضهم قالوا: العمل الكثير اشتمل على عدد الثلاث، واستدل هذا القائل بما روى الحسن عن أبي حنيفة إذا تروَّح المصلي بمروحة مرة أو مرتين لا تفسد صلاته، وإن زادت على ذلك فسدت صلاته

-কোন বিষয় আমলে কাসীর কিংবা তদপেক্ষা কম হওয়ার বিষয় নিরূপনে মনিষীগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, কোন কাজ তিনবার হলে সেটা আমলে কাসীর হবে। এ বিষয়ে তাদের দলীল হচ্ছে- হাসান (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন মুসল্লি নামাযে পাখা একবার কিংবা দুইবার ব্যবহার করে বাতাস গ্রহণ করে তাহলে তার নামায ফাসিদ হবে না, তবে যদি এর চেয়ে অধিক (তথা তিনবার) ব্যবহার করে তাহলে তার নামায ফাসিদ হবে। (আল মুহীতুল বুরহানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৫)



খাদ্য

ঘরোয়া

ফৌজিয়া সুলতানা জুঁই

বর্তমান সময়ে চুল পড়া একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় সবাই কম-বেশি এই সমস্যায় ভুগছেন। বাজারে নানা ধরনের শ্যাম্পু, হেয়ার অয়েল, কন্ডিশনার কিনতে পাওয়া গেলেও সেগুলো সবার জন্য কার্যকর না-ও হতে পারে। এরচেয়ে বরং ঘরোয়াভাবে কিছু উপায় অনুসরণ করে চুলের প্রাকৃতিক যত্ন নিতে পারলে এই সমস্যা থেকে অনেকটাই সমাধান পাওয়া সম্ভব।

নারকেল তেল ও পেঁয়াজের রস

প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে পেঁয়াজের রস অত্যন্ত কার্যকর। এটি মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং নতুন চুল গজাতে সহায়তা করে। ২ টেবিল চামচ পেঁয়াজের রসের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ নারকেল তেল মিশিয়ে স্ক্যাল্প বা মাথার খুলিতে মালিশ করলে চুলের গোড়া শক্ত হয়। এভাবে সপ্তাহে ২-৩ বার নিয়ম করে ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

আমলকী, রিঠা ও শিকাকাইয়ের প্যাক

সমপরিমাণ আমলকী,রিঠা ও শিকাকাই গুঁড়ো করে পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে একটি পেস্ট তৈরি করুন। এই তিনটি উপাদান চুলের জন্য খুব উপকারী। এই পেস্ট চুলে লাগিয়ে আধা ঘণ্টা রাখুন,এরপর ধুয়ে ফেলুন। এটি চুল পরিষ্কার রাখে,চুলের খুশকি রোধ করে এবং নতুন চুল গজাতে সহায়তা করে।

মেথি ও কালোজিরা

মেথিতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও কালোজিরাতে থাইমোকুইনন থাকে। যা চুলের গোড়াকে মজবুত করতে ও চুলপড়া রোধ করতে সহায়তা করে। ৩ টেবিল চামচ মেথি এক কাপ পানিতে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন। সকালে পানিটুকু ছেঁকে নিন। শ্যাম্পু করার আগে এই পানি দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। এটি চুলকে ম্যানেজেবল করে চুলকে সিল্কি এবং চকচকে করে তুলতে সাহায্য করে। এছাড়াও পরিমাণমত মেথি,আমলকী,কালোজিরা,লবঙ্গ একসাথে থেঁতো করে নিয়ে তাতে নারিকেল তেল মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিন। এরপর মিশ্রণটি চুলাতে অল্প আঁচে কয়েক মিনিট ভালোমতো নেড়েচেড়ে জ্বাল দিন। চুলা থেকে নামিয়ে ঠাণ্ডা করে মিশ্রণটি ছেঁকে কাঁচের বোতলে সংরক্ষণ করুন। নিয়মিত এই তেল ব্যবহার করলে অতিরিক্ত চুলপড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

সুষম খাদ্য ও পর্যাপ্ত পানি

চুল পড়ার অন্যতম কারণ হলো পুষ্টির ঘাটতি। পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে ফলমূল, শস্যদানা, সবুজ শাকসবজি, মাছ, গোশত, দুধ, ডিম, ছোলা, রসুন, টমেটো, মটর, ডাল, মাশরুম ইত্যাদি তথা প্রোটিন, আয়রন, ভিটামিন-বি ও জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া প্রয়োজন। যা শরীর ও চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এবং প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে। প্রতিদিন অন্তত ৮ গ্লাস পানি পান করলে শরীর আর্দ্র থাকে,যা চুলের রুক্ষতা ও চুল পড়া কমাতে সহায়তা করে।

মানসিক চাপ ও ঘুমের প্রভাব: আমাদের স্বাস্থ্য,মানসিক প্রশান্তি এবং চুলের স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম অপরিহার্য। কেননা দুশ্চিন্তা,উদ্বেগ,বিষণ্নতা এবং ঘুমের অভাব চুল পড়ার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। নিয়মিত নামায,কুরআন তিলাওয়াত,ইসলামী সঙ্গীত ও ধর্মীয় আলোচনা শোনার মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি পাওয়া যায় মানসিক প্রশান্তি থাকলে এমনিতেই ভালো ঘুম হবে। আর ভালো ঘুম হলে চুলও ভালো থাকবে।

চুল মানুষের সৌন্দর্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একে অবহেলা করলে শুধু সৌন্দর্য নয়,আত্মবিশ্বাসেও প্রভাব ফেলে। তাই নিয়মিত চুল পরিষ্কার রাখা,তেল ব্যবহার,প্রাকৃতিক উপাদানে যত্ন নেওয়া এবং স্বাস্থ্যকর জীবন ধারায় অভ্যস্ত হওয়াই চুল পড়া রোধের শ্রেষ্ঠ উপায়। চুলের প্রাকৃতিক যত্নের বিকল্প নেই। তাই শুধুমাত্র বাজারের পণ্যের উপর নির্ভর না করে ঘরোয়া পদ্ধতিতে চুলের যত্ন নিন। এতে শুধু চুলপড়া কমবে না বরং চুল হবে ঘন,দীর্ঘ,উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

পাকা আমের ঘরোয়া নোনতা-মিষ্টি রেসিপি "আমের মালপোয়া"

আম নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলে চট করে শেষ হবে না। আপাতত স্রেফ এটুকু জেনে রাখুন যে, আপনার শরীরবৃত্তীয় নানা কাজকর্ম ঠিকভাবে করার জন্য যতটা ভিটামিন সি প্রয়োজন,তার অনেকটার জোগান মেলে আম থেকে। তাই ওজন বাড়ার ভয় না পেয়ে নিশ্চিন্তে তা খেতে পারেন। তবে অনেকেই বলেন, দিনের আলো থাকতে থাকতেই ফল খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলা উচিত,তাতে হজমের সমস্যা এড়ানো সম্ভব হয়। তেমনটা করে দেখতেও পারেন।

উপকরণ

২০০ গ্রাম ময়দা,১চা চামচ মৌরি,১চা চামচ ছোটো এলাচ,১কাপ ঘি,২৫০ মিলি পানি,৫০ গ্রাম খোয়া ক্ষীর,১০০ গ্রাম সুজি,½ চাচামচ বেকিং পাউডার,৫০০ মিলি দুধ,২৫০ গ্রাম চিনি,১০০ মিলি আমরস,সামান্য জাফরান।

পদ্ধতি

প্রথমে চিনির রস তৈরি করতে হবে। গভীর পাত্রে চিনি আর পানি দিয়ে কম আঁচে গ্যাসে চাপান। চিনি পুরো গলে যাওয়া পর্যন্ত নাড়তে হবে। এবার উপর থেকে ১চা চামচ দুধ দিন। রস ফুটে উঠে চিনি গাদ বা ময়লা বেরোবে,সেটা উপর থেকে ফেলে দিন। স্বচ্ছ কাচের মতো রস ফুটে ফুটে গাঢ় হলে নামিয়ে সরিয়ে রাখুন। এবার মালপোয়া ব্যাটার তৈরির পালা। শুকনো পাত্রে সুজি,ময়দা,খোয়া ক্ষীর,মৌরি,ছোটো এলাচের গুঁড়ো, দুধ ভালো করে মিশিয়ে একটা ব্যাটার বানান। হাতা করে ঢাললে মসৃণভাবে নিচে পড়ছে কিনা দেখে নেবেন। একটু সময় রাখুন,তাতে ফ্লেভারটা তৈরি হবে। তারপর ছোট কড়াইয়ে ঘি গরম করে হাতা ভরা মালপোয়া দিয়ে ভেজে নিন এক এক করে। ঘি ঝরিয়ে নিয়ে রসে ডুবিয়ে রাখুন মিনিট দশেক। তারপর তুলে নিয়ে উপরে আমরস মাখিয়ে নিন। পরিবেশনের আগে বাদাম,পেস্তা,গুলকন্দ দিয়ে ইচ্ছেমতো সাজিয়ে নিতে পারেন।

বিজ্ঞান

পরওয়ানা ডেস্ক

বর্তমান যুগ আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ। এই যুগে কুসংস্কারে বিশ্বাস করা মানুষ খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু আগের যুগের মানুষ নানা কুসংস্কারে বিশ্বাস করত এবং সে অনুযায়ী অনেক কাজও করত। মজার বিষয় হলো, তারা কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে এমন কিছু কাজ করত যা খুবই বিজ্ঞানসম্মত কিন্তু তারা এই ব্যাপারে কিছুই জানত না, তবে ফল ভোগ করত ঠিকই। এ ধরনের দুটি বিষয় নিয়ে আমার জানবো।

১। অনেককাল আগের কথা। তখন কলেরা নামক রোগে অনেক মানুষ মারা যেত। অনেক সময় এটা মহামারি আকার ধারণ করত। দেখা যেতো, কোন এক বাড়িতে কলেরা হলে তা ঐ বাড়ির বাম বা ডান পাশের বাড়িগুলোতে ছড়িয়ে পড়ত কিন্তু অপর পাশের বাড়ির লোকদের কিছু হতো না। এজন্য তখনকার লোকদের কুসংস্কার ছিল যে,এই কলেরার জন্য দায়ী এক চোখ কানা বুড়ি। সে বুড়ি শুধু একদিকেই দেখতো এজন্য কলেরা শুধু একদিকেই ছড়াত। তারা বিশ্বাস করতো, যদি বুড়ির আরেক চোখ কানা করে দেওয়া যায় তবে আর কলেরা ছড়াবে না। এজন্য তারা লোহার রড অথবা এই জাতীয় কিছু খুব উত্তপ্ত করে পানির কলসের মধ্যে ডুবিয়ে রাখত। এরপর দেখা যেত আর কারো কলেরা হতো না। তারা তখন ভাবতো বুড়ির এক চোখ কানা করে দেওয়াতে আর কলেরা হচ্ছে না।

বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা: আমরা জানি কলেরা হচ্ছে জীবাণুঘটিত পানিবাহিত একটি রোগ। কলেরাজীবাণু মিশ্রিত পানি পান করলে কলেরা রোগ হবেই। আগেকার দিনের পানির মাধ্যমে মানুষের কলেরা ছড়াত। আর যখন তারা বুড়ির চোখ কানা করার জন্য লোহা উত্তপ্ত করে পানিতে ডুবিয়ে রাখতো, তখন তাপে পানিতে থাকা কলেরার জীবাণুগুলো ধ্বংস হয়ে যেতো। ফলে আর কলেরা হতো না। এজন্য পানি ফুটিয়ে জীবানুমুক্ত করে পান করার জন্য বলা হয়।

২। ধোপার কাজ কি তা আমরা সবাই জানি। আগেকার দিনের ধোপারা কাপড় কাচার পর ধোয়ার জন্য পুকুরে বা খাল-বিলে যেত। সেখানে পানিতে খোলা জায়গায় কাপড় না ধুয়ে যেখানে কচুরিপানা আছে সেখানে কচুরিপানা সরিয়ে কাপড় ধৌত করত। কিন্তু কেন তারা এমনটা করতো বলতে পারত না, যা ছিল অনেকটা কুসংস্কারের মতই। কিন্তু দেখা যেতো ঠিকই সেই পানিতে কাপড় খুব ভালোভাবে পরিষ্কার হত।

বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা: পানি দুই প্রকার। মৃদুপানি ও খরপানি। মৃদু পানিতে কাপড় ভালো পরিষ্কার হয় কিন্তু খর পানিতে কাপড় ভালোভাবে পরিষ্কার হয় না বরং প্রচুর সাবানেরও অপচয় হয়। পুকুরের পানির খোলা জায়গার পানির তুলনায় কচুরিপানার নিচের পানির খরতা অনেক কম। এর কারণ হলো, কচুরিপানার নিচের অংশের যে কালো দাড়ির মত অংশ থাকে তা পানিতে খরতার জন্য দায়ী যে সকল লবণ বা পদার্থ দ্রবীভূত আছে সেগুলো অনেকটা ছেঁকে ফেলে। ফলে, ঐ অংশের পানির খরতা খুব কম হয়। এজন্য সে পানিতে কাপড় বেশি পরিষ্কার হয়।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানব দেহ হলো সবচেয়ে জটিল একটি শরীর বৃত্তীয় সংগঠন। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞান মানুষের শরীরের বিষয়ে অনেক তথ্য পেলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো মানব দেহ অজানা রহস্যে ঘেরা। আমরা মানব দেহ সম্পর্কে কিছু তথ্য জানবো, যা হয়তো অনেকেই আগে জানতেন না।

- মানুষ চোখ খুলে হাঁচি দিতে পারে না।
- মানব শিশু বসন্তকালে দ্রুত বড় হয়।
- মানব দেহের ক্ষুদ্রতম হাড় হলো কানের হাড়।
- মানব দেহের সবচেয় বড় হাড় হলো পাঁজর।
- মানুষের চোখের ওপর ভ্রু-তে ৫০০টি লোম আছে।
- মানব দেহের সবচেয়ে শক্তিশালী পেশি হচ্ছে জিহ্বা।
- রাতের তুলনায় সকালে মানুষের দেহ দ্রুত লম্বা হয়।
- মানব দেহের হাড় পাথর থেকে ৪গুণ বেশি শক্তিশালী।
- মানব দেহ ১০০ বিলিয়ন এর অধিক নার্ভ সেল নিয়ে গঠিত।
- মানুষের মাথার খুলি ২৬ ধরণের ভিন্ন ভিন্ন হাড় দিয়ে তৈরি।
- মানব দেহের রক্তে একটি সমুদ্রের সমপরিমাণ লবণ রয়েছে।
- মানুষের মুখ থেকে পেটে খাদ্য পৌছাতে মাত্র ৭ সেকেন্ড সময় লাগে।
- প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে শিশুদের মুখে যে কোনো খাবারের স্বাদ থাকে বেশি।
- মানুষের হৃদপিণ্ড দৈনিক ১০০বার করে দেহে রক্ত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রবাহিত করে।
- মানুষ হাঁচি দিলে যে বাতাস বের হয় তা প্রতিঘণ্টায় ১০০ মাইল গতিতে বাহির হয়।
- আমরা যখন কোনো খাবার খাই আমাদের মুখে সেই খাবারের স্বাদ ১০দিন পর্যন্ত থাকে।
- মানুষ হাঁটুর ক্যাপ ছাড়া জন্মগ্রহণ করে এবং তা প্রথম ২ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত দেখা যায় না।
- মানুষের চোখের একটি পাপড়ি ১৫০ দিন বেঁচে থাকে। এরপর নিজে থেকেই তা ঝরে পড়ে।
- মানুষের চোখ সব সময় একই রকম থাকে কিন্তু কান ও নাক বৃদ্ধি পাওয়া কখনোই থেমে থাকে না।
- মানুষ ৩০০টি হাড় নিয়ে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর মানুষের দেহে ২০৬ টি হাড় থাকে।
- মানুষের হাতের নখে যেই পদার্থ আছে ঠিক সেই পদার্থ দিয়ে আমাদের চুল তৈরি হয়ে থাকে, ফলে হাতের নখ এবং চুল উভয় একই জিনিস, তবে দুইটির ঘনত্ব আলাদা।
- মানুষ যখন হাঁচি দেয় তখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ বন্ধ হয়ে যায়; এমনকি হৃদস্পন্দনও (Heartbeat) থেমে যায়।

অভ্যন্তরীণ

বিনিয়োগ সম্মেলন-২০২৫ অনুষ্ঠিত

গত ৭ এপ্রিল, সোমবার থেকে রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে চার দিনব্যাপী বিনিয়োগ সম্মেলন-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, ভারত, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়াসহ ৫০টি দেশের ৫৫০ জন বিনিয়োগকারী অংশ নিয়েছেন। এদের বেশিরভাগই বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এসব প্রতিশ্রুত বিনিয়োগ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ তৈরি করবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)। বিডা আয়োজিত চার দিনব্যাপী 'বিনিয়োগ সম্মেলন-২০২৫'-এর শেষ দিনে সমাপনী সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানানো হয়। বিনিয়োগ সম্মেলনের শেষ দিন চারটি ব্রেক আউট সেশন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে—হেলথকেয়ার, ডিজিটাল ইকোনমি, সেমিকন্ডাক্টর ও টেক্সটাইল। এসব খাতে বিনিয়োগের জন্য একটি পাইপলাইন তৈরির জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশে ব্যবসা বাড়ানো ও বিনিয়োগের কথা জানিয়েছে তিনটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে—স্পেনের খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিটেক্স, সিমেন্ট খাতের কোম্পানি লাফার্জহোলসিম ও চীনের অ্যাপারেল কোম্পানি হান্ডা ইন্ডাস্ট্রিজ। বড় আকারে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগকারীরা।

১৫ বছর পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠক

প্রায় ১৫ বছর পর গত ১৭ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার ঢাকায় বৈঠকে বসেছিলেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দুই পররাষ্ট্রসচিব। এ আলোচনাকে দেখা হচ্ছে দেড় দশকের স্থবির সম্পর্ক পুনরুজ্জীবনের প্রথম ধাপ হিসেবে। কেননা দুই পক্ষই সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কৃষি, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও পর্যটন খাতে সহযোগিতার ওপর জোর দিয়েছে। বৈঠকের পর দুই পক্ষই আলাদা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পাশাপাশি সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেছে। সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, বোঝাপড়া ও অভিন্ন স্বার্থে জোর দিয়েছে। আর পাকিস্তান সম্পর্ক এগিয়ে নিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও কৌশলগত সহযোগিতাসহ নানা বিষয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছে। স্থবির সম্পর্ক পুনর্গঠন দুই পক্ষের একমতের বিষয়গুলো তাদের সংবাদ সম্মেলন ও বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিফলিত হলেও কিছুটা ব্যতিক্রমও আছে। পাকিস্তানের বিজ্ঞপ্তিতে একাত্তরে বাংলাদেশে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর গণহত্যার জন্য দেশটির আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাওয়া, আটকে পড়া পাকিস্তানিদের প্রত্যাবাসন এবং অবিভাজিত সম্পদে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা প্রদান এই অমীমাংসিত ঐতিহাসিক তিনটি বিষয়ের সমাধানের প্রসঙ্গ ঊহ্য থেকেছে। এর আগে ২০১০ সালের ১ নভেম্বর বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠকের পরও একাত্তরে গণহত্যার জন্য ক্ষমাসহ উক্ত তিন সমস্যার কথা বাংলাদেশের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ ছিল কিন্তু পাকিস্তানের বিজ্ঞপ্তিতে তারা এড়িয়ে গিয়েছিল। সে সময়ও পাকিস্তান অনিষ্পন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দিয়েছিল।

নিপীড়িত মুসলমানের সমর্থনে আধিপত্যবাদ বিরোধী মুসলিম ঐক্যমঞ্চের সমাবেশ

ফিলিস্তিন, ভারত ও মিয়ানমারসহ বিশ্বজুড়ে নিপীড়িত মুসলমানের সমর্থনে সমাবেশ করেছে আধিপত্যবাদ বিরোধী মুসলিম ঐক্যমঞ্চ। ২৬ এপ্রিল, শনিবার বেলা ১২টা থেকে এই সমাবেশ শুরু হলেও ভোর থেকেই ঢাকা প্রেস ক্লাবের সামনে জড়ো হতে থাকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষ। দেশের বিভিন্ন খানকাভিত্তিক আলিম-উলামা ও পীর মাশায়িখগণ এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন । সমাবেশটি প্রথমে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হওয়ার কথা থাকলেও প্রশাসন তা পরিবর্তন করে প্রেস ক্লাবে অনুমতি দেয়। সমাবেশের কারণে প্রেসক্লাবের আশেপাশের সড়কে তীব্র যানজট তৈরি হয়। পরে পুলিশের অনুরোধে নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রোগ্রাম শেষ করা হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সাথে ফ্যাসিবাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা মাযলুমের পক্ষে কথা বলি। আমরা যালিমের বিপক্ষে রুখে দাঁড়াই। মাযলুমের পক্ষে দাঁড়াতে গিয়ে যদি জান দিতে হয় তাহলে জান দিতে প্রস্তুত আছি। গাযাতে ইসরাইলী বাহিনী যুলুম ও বর্বরতা চালাচ্ছে। আসুন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। ইসরাইলকে বয়কট করি। সমাবেশের শেষ ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। ঘোষণাপত্রে ছয়টি দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলো হলো— ১. জাতিসংঘের সরাসরি হস্তক্ষেপে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। ২. ইসরায়েলের হামলায় ফিলিস্তিনের যত কাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে সকল কিছুর আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৩. ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের সরাসরি হস্তক্ষেপে যত হত্যা হয়েছে আন্তর্জাতিক আদালতে সকল হত্যাকাণ্ডের তদন্তপূর্বক বিচার নিশ্চিত করতে হবে। ৪. ইন্ডিয়ার লোকসভায় পাস হওয়া ওয়াকফ বিল লোকসভায় বাতিল ঘোষণা করতে হবে। ৫. আগস্ট থেকে এই পর্যন্ত মাযার, খানকায় ও দরবারে যত হামলা, অগ্নিসংযোগ হয়েছে সবগুলো ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। ৬. সকল রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে পতিত স্বৈরাচার কর্তৃক সংঘটিত সকল বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত করতে হবে। এসময় আয়োজকরা হাত তুলে ইসরায়েল ও ভারতসহ সকল প্রকার বৈশ্বিক ও দেশীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের লড়াই জারি রাখার অঙ্গীকার করেন।

ছারছীনা ও ফুলতলী দরবারের পারস্পরিক মতবিনিময়

সম্প্রতি রাজধানীতে ছারছীনা ও ফুলতলী দরবারের পারস্পরিক মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছারছীনার পীর সাহেব মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ হুসাইন এবং ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র)-এর নাতি মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলীর মধ্যে অনুষ্ঠিত সৌহার্দ্যপূর্ণ মতবিনিময়ে কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি দেশ ও মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। দেশের স্বার্থ রক্ষা ও ইসলামের বৃহত্তর কল্যাণে ছারছীনা ও ফুলতলী সিলসিলার পূর্বসূরি বুযুর্গদের অবদানের কথা তারা স্মরণ করেন। তাঁদের রেখে যাওয়া আদর্শের ভিত্তিতে দেশ, জাতি, দ্বীন ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার ব্যাপারে তারা প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষাধারা সমুন্নত রাখার উপর তারা গুরুত্বারোপ করেন। ছারছীনার পীর সাহেব এবং মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.)-এর স্মরণে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে শহীদে বালাকোটের অনুসারী সকল মাশাইখের উপস্থিতি নিশ্চিতের বিষয়েও আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুজাহিদ ও ইসলামী চেতনার পুরোধা ব্যক্তিত্ব হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.)-এর স্মরণে আগামী ৬ মে মঙ্গলবার জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনের আয়োজন করছে বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ। ছারছীনার পীর সাহেব এই মহতী উদ্যোগের বিষয়ে জানান, সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর জীবন ও আদর্শ নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার এ প্রয়াস সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.) ব্রিটিশরাজের পতন এবং মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার আন্দোলনে লড়াইরত অবস্থায় ঐতিহাসিক বালাকোট প্রান্তরে শহীদ হন। তাঁর আত্মত্যাগ মুসলিম উম্মাহর রূহানী চেতনা ও ঐক্যের প্রতীক। সম্মেলনে দেশের খ্যাতনামা পীর-মাশাইখ আলিম-উলামা, ইসলামী চিন্তাবিদ-গবেষক ও বিশিষ্টজনেরা অংশগ্রহণ করবেন।

মাওলানা রঈস উদ্দীন হত্যাকাণ্ডে তালামীযে ইসলামিয়ার নিন্দা

মব সৃষ্টি করে গাজিপুরের একটি মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা রঈস উদ্দীনকে নৃশংসভাবে হত্যার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া। পাশাপাশি পুলিশের পক্ষ থেকে ভিকটিমকে অসহযোগিতারও প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিবৃতিতে এ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহবুবুর রহমান ফরহাদ ও সাধারণ সম্পাদক এস এম মনোয়ার হোসেন। নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে বলেন, অপবাদ দিয়ে মাওলানা রঈস উদ্দীনকে

নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আমরা সংক্ষুব্ধ ও ব্যথিত। শুধুমাত্র ভিন্ন আদর্শের অনুসারী হওয়ার কারণে ফিলিস্তিন ও ভারতের ময়লুম মুসলমানদের পক্ষে সমাবেশে অংশগ্রহণ করায় তাঁকে অপবাদ দিয়ে মব সৃষ্টি করে অমানবিক নির্যাতন করা হয়। একটা স্বাধীন দেশে এ ধরনের অমানবিকতা ও অন্যায় কর্মকাণ্ড মেনে নেওয়া যায় না। আমরা মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি যে, পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার পর নির্যাতিত সেই ইমামের চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে উল্টো তাকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করে এবং পরবর্তীতে পুলিশি হিফাযতে তাঁর মৃত্যু হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে একজন পুলিশ সদস্য তাকে পানি পর্যন্ত খেতে দেয়নি । এটা চরম অমানবিক আচরণ। এখনও পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে নানা অসহযোগিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মব সৃষ্টিকারীদের স্পষ্ট ভিডিও থাকা সত্ত্বেও এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, যা অত্যন্ত রহস্যজনক। আমরা এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সকল অপরাধীর দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। পাশাপাশি যে পুলিশ সদস্যরা নির্যাতিত ইমামের চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আহবান জানাচ্ছি।

আন্তর্জাতিক

চীনের ওপর বৃদ্ধি, অন্য দেশের শুল্ক স্থগিত ট্রাম্পের

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্ব অর্থনীতিকে টালমাটাল পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়া শুল্কযুদ্ধ নিয়ে নতুন ঘোষণা দিয়েছেন । তিনি সব দেশের জন্য নতুন আরোপ করা পাল্টা শুল্ক ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করেছেন। এই সময়ে দেশগুলোর পণ্যে পাল্টা শুল্ক ন্যূনতম ১০ শতাংশ কার্যকর হবে। কিন্তু চীনা পণ্যের ওপর শুল্কের হার ১২৫ শতাংশে উন্নীত করেছেন ট্রাম্প। এর মাধ্যমে তিনি বেইজিংয়ের সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র করলেন। ৯ এপ্রিল বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে এই সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিক কার্যকর হবে বলেও জানিয়েছেন । ট্রাম্প বলেছেন,তিনি চীনের ওপর শুল্ক বাড়াচ্ছেন যাতে বেইজিংকে আলোচনার টেবিলে আনা যায়। এদিকে শুল্ক স্থগিত করার অনুরোধ রাখায় ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্টের অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্ট মেনশন করে ইউনূস বলেছেন,৯০ দিনের শুল্ক স্থগিত করতে আমরা যে অনুরোধ করেছিলাম,তাতে ইতিবাচক সাড়া দেওয়ায় প্রেসিডেন্ট আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার বাণিজ্য এজেন্ডাকে সমর্থন জানাতে আমরা আপনার প্রশাসনের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাব। এর আগে বাংলাদেশের ওপর আরোপিত বাড়তি শুল্ক তিন মাসের জন্য স্থগিত করতে ট্রাম্পকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন ড. ইউনূস। শতাধিক দেশের ওপর চড়া হারে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়ে এক সপ্তাহের মাথায় তা স্থগিতের ঘোষণা দেন ট্রাম্প।

ওয়াকফ বিল পাসের প্রতিবাদে ভারতজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ

ভারতের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় পাস হওয়ার পর উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায়ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাস হয়েছে। দীর্ঘ বিতর্কের পর ভোটাভুটিতে বিলের পক্ষে ১২৮টি এবং বিপক্ষে ৯৫টি ভোট পড়ে। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পরই বিলটি আইনে পরিণত হবে। তবে বিরোধী দল কংগ্রেস এত সহজে হার মানছে না। কংগ্রেসের মুখপাত্র বলেন,আমরা শিগগিরই ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল-২০২৫-এর সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে যাব। কংগ্রেস সাংসদ সোনিয়া গান্ধী এই বিলকে সংবিধানের ওপর 'স্পষ্ট আক্রমণ' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, বিজেপি সমাজকে 'স্থায়ীভাবে বিভক্ত' রাখতে চায়। বিজেপি তাঁর এই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছে। পার্লামেন্টে এই বিল নিয়ে তীব্র বাগ্বিতণ্ডা হয়। রাজ্যসভায় রেকর্ড ১৭ ঘণ্টা ২ মিনিট এবং লোকসভায় ১২ ঘণ্টার বেশি আলোচনা হয়। বিতর্কিত বিলটি পাসের প্রতিবাদে জয়েন্ট ফোরাম ফর ওয়াকফ প্রোটেকশনের ডাকে কলকাতা,চেন্নাই ও আহমেদাবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। জুমুআর নামায শেষে মুসলিম সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন। বিক্ষোভকারীরা জাতীয় পতাকা ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে 'ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রত্যাখ্যান' স্লোগান দেন। বিক্ষোভস্থলে উন্মুক্ত স্থানে জমায়েত হয়ে বক্তারা বিলটির বিরোধিতা করেন। আহমেদাবাদে পরিস্থিতি বেশি উত্তপ্ত ছিল। পুলিশ সেখানে রাস্তায় অবস্থান নেওয়া বিক্ষোভকারীদের জোর করে সরানোর চেষ্টা করে। চেন্নাইয়ে অভিনেতা বিজয়ের তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম (টিভিকে) রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভের ডাক দেন। লক্ষ্ণৌয়েও উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গে আগামী বছর নির্বাচনের মুখে এই বিক্ষোভ পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাসের পক্ষে দলের সমর্থনের প্রতিবাদে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দল ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন জনতা দলের (ইউনাইটেড) দুই শীর্ষ নেতা। দলত্যাগ করা নেতাদের মধ্যে আছেন মোহম্মদ কাসিম আনসারি এবং দলের সংখ্যালঘু সেলের প্রধান মোহম্মদ আশরাফ আনসারি।

গাযায় গণহত্যা বন্ধের দাবিতে দেশে দেশে বিক্ষোভ

ফিলিস্তিনের গাযায় ইসরায়েলী বাহিনীর গণহত্যা বন্ধের দাবিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাস্তায় নেমেছে হাজার হাজার মানুষ। তারা গাযায় বর্বর হামলা এবং ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের নিন্দা জানিয়েছেন। এছাড়া দ্রুত সময়ের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে বিক্ষোভ করেছে হাজার হাজার মানুষ। ওই সমাবেশে তিনশোর বেশি সংগঠন সমর্থন জানায়। উপস্থিত বিক্ষোভকারীরা ৩ নম্বর স্ট্রিট এনডব্লিউ ও পেনসিলভেনিয়া অ্যাভিনিউ এনডব্লিউয়ের চৌরাস্তায় সমবেত হয়। পরে তারা ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইসিই) সদর দপ্তরসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মিছিল করে। প্যালেস্টাইন ইয়ুথ মুভমেন্ট, দ্য পিপলস ফোরাম, ইহুদি ভয়েস ফর পিস এবং অ্যানসার কোয়ালিশনসহ বেশ কয়েকটি অ্যাডভোকেসি গ্রুপ এই বিক্ষোভের সহপৃষ্ঠপোষকতা করে। বিক্ষোভকারীরা গাযায় নিহত ফিলিস্তিনি শিশুদের প্ল্যাকার্ড ও পোস্টার প্রদর্শন করে। গাযায় ইসরায়েলের চলমান বর্বরতার বিরুদ্ধে মরক্কোয় ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। হাজারো বিক্ষোভকারী মরক্কোর রাস্তায় নেমে আসেন। গাযায় ইসরায়েলি যুদ্ধের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের বিরুদ্ধেও বিক্ষোভকারীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিগত কয়েক মাসের মধ্যে মরক্কোয় সবচেয়ে বড় বিক্ষোভগুলোর একটি হয়। বিক্ষোভকারীরা ইসরায়েলি পতাকা পদদলিত করেন। তাঁরা ইসরায়েলী হামলায় নিহত হামাস নেতাদের ব্যানার বহন করেন। এ ছাড়া তাঁরা বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনীদের ছবির সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি যুক্ত করে বানানো ক্ষোভের পোস্টারও বহন করেন। তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারাসহ তুরস্কের বিভিন্ন শহরে একই দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন হাজার হাজার মানুষ। যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সামরিক ও রাজনৈতিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখায় আঙ্কারায় মার্কিন দূতাবাসের সামনেও বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। এ সময় তারা 'জর্ডান নদীর তীর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত স্বাধীন ফিলিস্তিন চাই' মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক,ইসরায়েলের দখলদারি নিপাত যাক ইত্যাদি স্লোগানও দিয়েছেন। ফিলিস্তিনে ইসরায়েলী গণহত্যা বন্ধ ও স্বাধীন ফিলিস্তিনের দাবিতে ফিলিস্তিনের 'ওয়ার্ল্ড স্টপ ফর গাজা' কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এলাকায় বিক্ষোভ করছেন ছাত্র-জনতা। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, মেডিকেলের শিক্ষার্থী ও জনতা ঢাবির টিএসসিতে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। বিক্ষোভে ছাত্র-জনতা ইসরায়েলি পণ্য বয়কট ও ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে সবাইকে এক হয়ে লড়াই করার জন্য আহ্বান জানান। এদিকে ঢাকার সেহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্যালেস্টাইন সলিডারিটি মুভমেন্ট-বাংলাদেশ এর ব্যানারে দল-মত নির্বিশেষে দেশের সকল আলিম-উলামা ফিলিস্তিনে ইসরাইলী হামলার বিপক্ষে তীব্র নিন্দা জানান এবং সকলে ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষে একাত্মতা ঘোষনা করেন।

কবিতা

বখতিয়ারের ঘোড়া

আল মাহমুদ

মাঝে মাঝে হৃদয় যুদ্ধের জন্য হাহাকার করে ওঠে
মনে হয় রক্তই সমাধান,বারুদই অন্তিম তৃপ্তি;
আমি তখন স্বপ্নের ভেতর জিহাদ,জিহাদ বলে জেগে উঠি।
জেগেই দেখি কৈশোর আমাকে ঘিরে ধরেছে।
যেন বালিশে মাথা রাখতে চায় না এ বালক,
যেন ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে মশারি,
মাতৃস্তনের পাশে দু'চোখ কচলে উঠে দাঁড়াবে এখুনি;
বাইরে তার ঘোড়া অস্থির,বাতাসে কেশর কাঁপছে।
আর সময়ের গতির ওপর লাফিয়ে উঠেছে সে।

না,এখনও সে শিশু। মা তাকে ছেলে ভোলানো ছড়া শোনায়।
বলে,বালিশে মাথা রাখো তো বেটা। শোনো
বখতিয়ারের ঘোড়া আসছে।
আসছে আমাদের সতেরো সওয়ারি
হাতে নাঙ্গা তলোয়ার।

মায়ের ছড়াগানে কৌতূহলী কানপাতে বালিশে
নিজের দিলের শব্দ বালিশের সিনার ভিতর।
সে ভাবে সে শুনতে পাচ্ছে ঘোড়দৌড়। বলে,কে মা
বখতিয়ার?
আমি বখতিয়ারের ঘোড়া দেখবো।

মা পাখা ঘোরাতে ঘোরাতে হাসেন,
আল্লার সেপাই তিনি,দুঃখীদের রাজা।
যেখানে আযান দিতে ভয় পান মুমিনেরা,
আর মানুষ করে মানুষের পূজা,
সেখানেই আসেন তিনি। খিলজীদের শাদা ঘোড়ার সওয়ারি।
দেখো দেখো জালিম পালায় খিড়কি দিয়ে
দেখো, দেখো
মায়ের কেচ্ছায় ঘুমিয়ে পড়ে বালক
তুলোর ভেতর অশ্বখুরের শব্দে স্বপ্ন তার
নিশেন ওড়ায়।

কোথায় সে বালক?
আজ আবার হৃদয়ে কেবল যুদ্ধের দামামা
মনে হয় রক্তেই ফয়সালা।
বারুদই বিচারক। আর
স্বপ্নের ভেতর জিহাদ জিহাদ বলে জেগে ওঠা।

মুসলিম জাগরণের কবি

(কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন স্মরণে)

আ. শ. ম. বাবর আলী

'অসির চেয়ে মসি বড়' নয় কথাটা ভুল,
নয়তো এটা মিথ্যে প্রবাদ প্রমাণ যে নজরুল।
ঘুমিয়ে ছিল মুমিন জাতি কৃষ্টি আপন ভুলে,
মসি দিয়ে শক্তি দিলেন ঘুম থেকে সব তুলে।
মুসলিম জাতির বীরকাহিনী তাঁর কলমে লিখে
জাগরণের মন্ত্রধ্বনি তুললেন চতুর্দিকে।
এই জাতিটার কৃষ্টিকথা রূপ পেলো তাঁর লেখায়,
ধর্মবলে গড়তে জীবন তাঁর লেখা যে শেখায়।
বাংলা ভাষায় গযল গান যে তাঁর লেখাতে এলো,
আল্লাহ-নবীর পথ যে খুঁজে মুসলিম জাতি পেলো।
আল-কুরআন আর হাদীস পাকের বাণী প্রচার করে,
ইসলামী জোশ আনলেন তিনি মুমিনদের অন্তরে।
তাঁর লেখাতে পথ খুঁজে পায় ভ্রান্ত মুসলমানে,
সুপ্ত জাতি উঠলো জেগে তাঁর সে অবদানে।



হিকমাতের সন্ধানে

জামান আহমদ

একদিন হযরত মূসা (আ.) বনী-ইসরাঈলের এক সভায় বয়ান করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর নবী, মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? হযরত মূসা (আ.) মনে করলেন সে সময়ে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেউ নেই। তাই তিনি বলে ফেললেন, মানুষের মধ্যে আমিই সবচেয়ে জ্ঞানী। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে মূসা (আ.) এর এই জবাব পছন্দসই হলো না। আল্লাহ তাআলা মূসা (আ.) এর কাছে ওহী নাযিল করে জানালেন, দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে আমার এক বান্দা অবস্থান করছেন যিনি আপনার চেয়েও অধিক জ্ঞানী। একথা শুনে মূসা (আ.) তার খাদিম ইউশা বিন নূনকে বললেন, আল্লাহ তাআলা যেই জায়গার কথা বলেছেন আমি সেই জায়গায় না যাওয়া পর্যন্ত থামবো না। কুরআনে এসেছে– "স্মরণ করুন, যখন মূসা তার সঙ্গী যুবককে বলেছিলেন, দুই সাগরের মিলনস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না; যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবো। (সূরা কাহাফ, আয়াত: ৬০)

মূসা (আ.) সেই ব্যক্তির সাথে সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে দুই সমুদ্রের মিলনস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিখোঁজ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার ঐ বান্দার সাক্ষাৎ পাবেন। আল্লাহ তাআলার নির্দেশমত মূসা (আ.) থলের মধ্যে একটি ভাজামাছ নিয়ে খাদিমকে সাথে করে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে বিশ্রাম করার জন্য তারা একটি সমুদ্রের কিনারে পাথরখণ্ডের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং এক পর্যায়ে থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ তাআলা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে, সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। তারা ঘুম থেকে উঠে সেখান থেকে সামনে রওয়ানা হলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলায় তারা দেখলেন থলের ভেতরে মাছটি নেই। মূসা (আ.) অনুমান করলেন তারা যেখানে ঘুমিয়েছিলেন সেখানেই মাছটি নিখোঁজ হয়েছে। অতএব, সেই জায়গাটাই তাদের গন্তব্যস্থল। কুরআনে এসেছে–"অতঃপর তারা উভয়েই যখন দুই সাগরের মিলনস্থলে পৌঁছলো, তখন তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেল; ফলে সেটা সুড়ঙ্গের মতো নিজের পথ করে সাগরে নেমে গেল। (সূরা কাহাফ, আয়াত: ৬১)

তৎক্ষণাৎ তারা পূর্বের পথ ধরে ফিরে চললেন। সেই পাথরখণ্ডের কাছে এসে দেখলেন, আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে এক ব্যক্তি শুয়ে আছেন। যিনি হলেন হযরত খাদির (আ.)। এমতাবস্থায়ই মূসা (আ.) তাকে সালাম দিলেন। চাদরাবৃত ব্যক্তি বললেন, এই জনমানবহীন স্থানে কে আমাকে সালাম দিলো? মূসা (আ.) বললেন, আমি মূসা! আপনার কাছ থেকে সেই বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ তাআলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনে এসেছে–"এরপর তারা সাক্ষাৎ পেলো আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের, যাকে আমি অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।" (সূরা কাহাফ, আয়াত: ৬৫)

হযরত খাদির (আ.) বললেন, আপনি কি বনী-ইসরাঈলের মূসা? তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ, আমিই বনী-ইসরাঈলের মূসা। তিনি বললেন, আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি তা আপনার জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরণের। তাই আমার কাজকর্ম আপনার কাছে আপত্তিকর বলে মনে হবে। আপনি আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। আসল রসহ্য না বলা পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আপনি আপত্তি করবেন। মূসা (আ.) বললেন, আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোনো আদেশ আমি অমান্য করব না। খাদির (আ.) বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি আমার সাথে থাকতে পারবেন তবে আমার কর্মকাণ্ডের বিষয়ে আমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজ থেকে তার হাকীকত না বলি। (সূরা কাহাফ, আয়াত: ৬৯-৭০)

এরপর তারা সমুদ্রের তীর ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর একটি নৌকায় আরোহন করলেন। নৌকার মাঝি হযরত খাদির (আ.) কে আগে থেকেই চিনতো, তাই সে তাদের কাছ থেকে কোনোরকম পারিশ্রমিক নিলো না। নামার সময় হযরত খাদির (আ.) নৌকায় একটি ছিদ্র করে ফেললেন। এটা দেখে মূসা (আ.) স্থির থাকতে না পেরে বললেন, কোনো প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই মাঝি আমাদেরকে নৌকায় আরোহন করালো আর আপনি কি না তার নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন; এটা কী ধরনের প্রতিদান? আপনি খুব মন্দ কাজ করলেন। খাদির (আ.) বললেন, আমি আগেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন না। মূসা (আ.) তখন ওযর পেশ করে বললেন, আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না। আগামীতে আর এমনটা হবে না। কুরআনে এসেছে– "অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল, অবশেষে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল তখন সে তা বিদীর্ণ

করে দিলো। মূসা বললেন, 'আপনি কি আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করার জন্য তা বিদীর্ণ করলেন? আপনি তো গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন!' সে (খাদির আ.) বলল, 'আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না? (সূরা কাহাফ, আয়াত: ৭১-৭২)

এরপর তারা আবারও পথ চলতে লাগলেন। একটি খোলা মাঠ দিয়ে যাওয়ার পথে দেখলেন কতগুলো বালক সেখানে খেলাধুলা করছে। খাদির (আ.) একটি বালককে ডেকে এনে তার দেহ থেকে মস্তক আলাদা করে ফেললেন! সঙ্গে সঙ্গে বালকটি মারা গেল। পূর্বের চেয়েও গুরুতর এই কাজ দেখে মূসা (আ.) সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, বিনা অপরাধে আপনি একটি নিষ্পাপ বালককে হত্যা করে নিঃসন্দেহে মস্তবড় গুনাহের কাজ করেছেন। খাদির (আ.) তার



কথার জবাব না দিয়েই বললেন, আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম, আমার সাথে আপনি ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। মূসা (আ.) এবার বললেন, এরপর যদি আমি আর কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করি তাহলে আপনি আমার সঙ্গ ছেড়ে দেবেন। কুরআনে এসেছে– মূসা বললেন, 'এরপর যদি আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আমার ওযর-আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে।' (সূরা কাহাফ, আয়াত ৭৯)

তারপর তারা আবারও চলতে লাগলেন। হাদীস শরীফে এসেছে, হাঁটতে হাঁটতে তারা একটি কৃপণ জনগোষ্ঠী সম্বলিত জনপদে পৌঁছলেন। তখন তারা ছিলেন খুব ক্ষুধার্ত। মুসাফির পরিচয় দিয়ে গ্রামবাসীর কাছে খাবার চাইলেন। কিন্তু কেউই তাদেরকে খাবার দিলো না। হযরত খাদির (আ.) দেখলেন গ্রামের একটি পুরাতন দেয়াল একেবারে কাত হয়ে পড়ে যাবার মতো অবস্থা। তিনি নিজ হাতে সেই দেয়ালটি মেরামত করে দিলেন। মূসা (আ.) বিস্মিত হয়ে গেলেন। বললেন, এই গ্রামের মানুষের কাছে আমরা খাবার চাইলাম কিন্তু তারা দিতে অস্বীকার করলো অথচ আপনি তাদের এত বড় একটি কাজ এমনিতে করে দিলেন? ইচ্ছা করলে তো এখন আপনি তাদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক আদায় করতে পারেন। খাদির (আ.) বললেন, আপনি আবারও আমার কাজে প্রশ্ন করেছেন। অতএব শর্তানুযায়ী এখানেই আমরা আলাদা হয়ে যাবো। তবে আলাদা হওয়ার আগে আপনার চোখের সামনে আমি যেগুলো ঘটিয়েছি এর স্বরূপ বলে দিতে চাই। তা হলো– আমরা যে নৌকাটিতে আরোহন করেছিলাম তা ছিল একজন গরীব মাঝির। এই নৌকা দিয়ে রোজগার করে সে তার দিনাতিপাত করে। সেই এলাকার যালিম রাজা ভালো নৌকাগুলো জোর করে ছিনিয়ে নেয়, তাই আমি নৌকাটি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত তাকে রক্ষা করেছি। এরপর যে বালককে আমি হত্যা করেছি তার পিতা-মাতা মুমিন। কিন্তু ঐ বালকটি বড় হয়ে সীমালঙ্ঘন করবে, কুফরীতে লিপ্ত হবে এবং তার পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে অতিষ্ট করে তুলবে; তাই আমি তাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় জান্নাতে পাঠিয়ে দিয়েছি। সবশেষে গ্রামে এসে আমরা যে দেয়ালটি মেরামত করেছি, সেই দেয়ালের নিচে দুইজন ইয়াতীম শিশুর সম্পদ লুকায়িত আছে। যাদের বাবা ছিলেন একজন সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তি। তারা বড় হওয়ার আগে অন্য কেউ যাতে সম্পদগুলো না পায় সেজন্য বিনা পারিশ্রমিকে আমি দেয়ালটি ঠিক করে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে এ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, মূসা (আ.) এর প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে, দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল। যদি মূসা (আ.) আরো কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে আরো কিছু জানা যেত।

বালাকোটের লড়াই

মোহাম্মদ খছরুজ্জামান

ভারত হতে ব্রিটিশ খেদাও এই স্লোগানটি যাঁদের
সৈয়দ আহমদ বেরলভী পীর অগ্রভাগে তাঁদের।

রূহানী শক্তি সঞ্চয়ে যান হজ্জে আরব দেশ
ভারত ফিরে জানান দিলেন বেনিয়া শোষণ শেষ।

খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে জয়ী শিখ সেনাদের সঙ্গে
বুঝলো ব্রিটিশ বিদায় নোটিশ থাকবো না আর বঙ্গে।

রাতে বেশি সময় দিতেন তরীকতের কাজে
রণ শিক্ষায় দিন যেতো তাঁর নিজে যোদ্ধা সেজে।

ছল শঠতার আশ্রয় নিলো বেনিয়া ফাসিক গোষ্ঠী
শিখ জেনারেল রণজিত সিং অর্থ লোভে তুষ্টি।

বীর মুজাহিদ সৈয়দ আহমদ এগিয়ে গেলেন যুদ্ধে
লেলিয়ে দিলো শিখ পাঠান আযাদী গান রুদ্ধে।

সিং খুবি খাঁ বেনিয়া দলের পা চাটা সব দালাল
বালাকোট যুদ্ধে মুজাহিদ-দল রক্তে লালে লাল।

শহীদ হলেন বেরলভী পীর স্বাধীনতার জন্য
সংগ্রামের নাম 'আযাদী আন্দোলন' ইতিহাস অগ্রগণ্য।

রাতের পীর দিনের বীর ইতিহাসে অল্প জুটে
একাত্তরের স্বাধীনতার বীজ বুনে বালাকোটে।

রূহানী সূত্রে উত্তরসূরী যাঁরা বেরলভী ভক্ত
চিন্তা-চেতনায় কেন জাগে না বালাকোটি সেই রক্ত?

ক্ষমা করো হে ফিলিস্তিন

আলিম উদ্দিন আলম

দিনের বেলা কোন কাজে মন বসে না
আমার ঘুম আসে না রাতের বিছানায়
দুটু চোখ ও মনটা পড়ে থাকে ঐ ফিলিস্তিনের গাযায়।

আমার হৃদয়টা কেঁপে ওঠে শরীরটা অবশ হয়ে যায়
যখন দেখি যালিম ইজরায়েলের তাণ্ডব
প্রথম কিবলা ঐ মসজিদুল আকসায়।

নিষ্পাপ শিশুদের ছবিগুলো আমাকে নীরবে কাঁদায়
আল্লাহর কসম আমার ঘুম আসে না
নিরুপায় আমি ছন্দহীন কবিতায়।

তোমার কৃতজ্ঞতা

আবুল আহসান ইয়াসিন

আমার ভালো মন্দ আমি বুঝিই বা আর কত
জীবন চলুক রাব্বে কারীম তোমার খুশি মতো।
যা কিছু চাই পাই বা না পাই সবর যেন রাখি
তোমার কৃতজ্ঞতায় কাটুক যে কটা দিন বাকি।

আমার মতো কে আর আছে এমন অধম পাপী
পাপের কথা স্মরণ হলে আত্মা উঠে কাঁপি
তবু এত রহম দিয়ে আগলে আমায় রাখো
আমি তোমায় ভুলে গেলেও তুমি ভুলো নাকো।

ভবের মোহে তোমার থেকে থাকি যখন দূরে
কী যেন এক শূণ্যতা রয় পাষাণ হৃদয় জুড়ে
ভয় পেয়ে যাই জীবনের এই উত্থান-পতন ঝড়ে
কাছে টেনে ডাকো তবু বান্দা আমার ওরে।

স্বীকার করি হুকুম তোমার মানছি না ঠিক মতো
দোয়া মাঙি মাফ করে দাও সারাও দীলের ক্ষত।

বালাকোটের চেতনা

ইয়াকুব আহমদ

বালাকোট চেতনায় ও যুবক ছুটে আয়
জিহাদের আহ্বানে যাই
দ্বীন ক্বায়েমের তরে এই যমীনের পরে
আয় কিছু রক্ত ঝরাই!

বাতিলের তরে বীর করবে না নিচু শির
বালাকোট এ বাণী শেখায়
বালাকোট ডাক দেয় এই ডাকে শুধু ন্যায়
জান্নাতি পথটা দেখায়!

ঈমানের জাগরণ চলবেই আমরণ
এ দ্বীনের পক্ষে লড়াই
চেতনায় ভরপুর ভয়-ভীতি কর দূর
আয় সবে বেদ্বীন সরাই।

কেন তুই ভীতু হস? ভয়ে ভয়ে পিছু রস
বালাকোট স্মরণে কি নাই?
এ প্রাণের মায়া বেশ? ঈমানের হয় শেষ
এই বাঁচা,বাঁচা না রে ভাই!

বেরলভী আজ নাই আছে তাঁর কাজটাই
প্রাণটাকে বিলিয়ে দিলেন
প্রাণ না রে দ্বীন আগে,ছিলো সেটা হৃদ বাগে
মুজাহিদ তিনি যে ছিলেন।

আয় চলি তাঁর পথে পীর-ওলী যাঁর মতে
এই পথ মদীনার-ই পথ
এই পথে চলে যাঁরা মরেও অমর তাঁরা
পতাকাটা উড়ে পতপত।

আর নয় চুপ থাকা শিরটাকে নিচ রাখা
সময়ের দাবি তা যে নয়
বেদ্বীনেরা আর কত মেরে যাবে শত শত
বদলা যে নিতে কিছু হয়।

ভুলে গিয়ে সব ভেদ বেদ্বীনেরে মার ছেদ
যারা শুধু মেরেই গেলো
হারে হারে শোধ নে,দেখে দেখে কোপ দে
এসবের ক্ষণ যে এলো।

দেশে দেশে মারে কেন আজ বুঝে যায় যেন
ঈমানের শক্তি না কম
মোরা যদি চাই খুন ঝরাবোই তবে শোন
আমাদেরও আছে বেশ দম।

শহীদী মরণ আছে গাজী হয় যেই বাঁচে
অতএব ভয়টা কীসের
ভয় সব দূর করে তাকবীর পড়ে পড়ে
দেব জ্বালা ওদেরে বিষের।

এখনো সময় আছে আর্জিটা তোর কাছে
দ্বীনটাকে আয় বাঁচাবো
মুমিনের খুনে যারা খুশিতে পাগলপারা
তাহাদেরে আজ নাচাবো।

পড় শিরে আমামা বাজা রণ দামামা
পারবে না রুখতে কেহ
সইব না আর কিছু ফিরবো না আর পিছু
প্রয়োজনে বিলাবো দেহ।

প্রেরণায় 'আহমদ' ধ্বংসীবো সব বদ
তাকবীরে তাকবীরে চল
আনবোই জয়টাকে ভুলে গিয়ে ভয়টাকে
ও যুবক যাবি কি না বল?



আযাদ কাশ্মীর

১৯৪৭ সালে লর্ড মাউন্টব্যাটেন কাশ্মীরের রাজা হরি সিংকে ভারতভুক্তির শর্তে তার শাসনকে অব্যাহত রাখার শর্ত দেন। এরপর যুদ্ধ বাঁধলে ভারত জাতিসংঘের দ্বারস্থ হয়। রাষ্ট্রসংঘ ভারত ও পাকিস্তানকে তাদের অধিকৃত এলাকা খালি করে দিয়ে রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোটের প্রস্তাব দেয়। ভারত প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫২ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচিত গণপরিষদ ভারতভুক্তির পক্ষে ভোট দিলে ভারত গণভোটের বিপক্ষে মত দেয়। কাশ্মীরের প্রায় ৯০ ভাগের বেশি মানুষ পাকিস্তানের অধীনে যাওয়ার পক্ষে থাকলেও ভারতের তীব্র আপত্তিতে আর গণভোট হয়নি। ফলে কাশ্মীর দু'ভাগ হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর হিসেবে পরিচিতি পায়। বর্তমানে পাকিস্তান তাদের নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরকে 'আযাদ কাশ্মীর' নামে অভিহিত করে থাকে। আসুন জেনে নেয়া যাক আযাদ কাশ্মীর সম্পর্কে কিছু তথ্য-

★ আযাদ কাশ্মীরের আয়তন ১৩,২৯৭ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ৪০ লাখ। আযাদ কাশ্মীরকে প্রশাসনিত স্তরে দু'ভাগে ভাগ করেছে পাকিস্তান। ১) আযাদ কাশ্মীর ২) গিলগিট-বাল্টিস্তান। এরমধ্যে ২০১৮ সালে গিলগিট ও বাল্টিস্তান প্রদেশে প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন করে পাকিস্তান (Pakistan)। অনিন্দ্যসুন্দর এই ভূমি দেখার জন্য লাখো পর্যটক পাড়ি জমান আযাদ কাশ্মীরে।

★ আযাদ কাশ্মীরের নিজস্ব প্রেসিডেন্ট রয়েছে। মন্ত্রিসভা সমর্থিত চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আযাদ কাশ্মীরের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম সুলতান মাহমুদ চৌধুরী। CEO তথা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন PMLN দলের চৌধুরী আনোয়ারুল হক। আযাদ কাশ্মীরের নিজস্ব বিধানসভা রয়েছে। স্বশাসিত বিধানসভা থাকলেও পাকিস্তান সরকারই তা নিয়ন্ত্রণ করে। পাকিস্তানের সেন্ট্রাল বোর্ড নয়, বরং আযাদ জম্মু-কাশ্মীর কাউন্সিলই প্রদেশের বাজেট ও রাজস্ব সম্পর্কিত বিষয় দেখভাল করে। আযাদ কাশ্মীরের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হলেন আযম খান।

★আযাদ কাশ্মীরের রাজধানী মুজাফফরাবাদ। ১০ জেলা রয়েছে এতে। রয়েছে ৩৩ তহশিল এবং ১৮২টি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাউন্সিল। ভারতের দখলকৃত কাশ্মীরের পূর্ব অংশ, পাকিস্তানের পাঞ্জাব, আফগানিস্তানের ওয়াখান করিডর এবং চিনের শিনজিয়াং অঞ্চলের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে আযাদ কাশ্মীর।

★ আযাদ কাশ্মীরের মানুষের মূল জীবিকা কৃষি। গম, ভুট্টা, পশুপালন ছাড়াও পাহাড়ি এই এলাকায় মাশরুম, মধু, আপেল, চেরি'র মতো কৃষিজাত পণ্য বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এছাড়াও বেশ কিছু বনৌষধি এবং কাঠের মতো শিল্পজাত পণ্য উৎপাদিত হয় সেখানে।

★ আযাদ কাশ্মীরে উর্দু, কাশ্মীরী, পঞ্জাবী ও পশতু ভাষায় কথা বলা হয়। তবে এই এলাকায় স্কুল-কলেজের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। আযাদ কাশ্মীরের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, এলাকায় সাক্ষরতার হার ৭৫ %। কিন্তু সে এলাকার জনগণ তাদের জীবিকার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন এবং কৃষি ও পর্যটনের কারণে সুখী জীবনযাপন করেন।

★ আযাদ কাশ্মীরের জনগণের অজস্র আত্মীয়স্বজনের বাস ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে। আযাদ কাশ্মীরীদের আশা, একদিন ভারতীয় হানাদারদের হাত থেকে মুক্ত হবে কাশ্মীরের অবশিষ্টাংশ। এই অপেক্ষায় প্রহর গুনে জীবন চলছে দিনের পরদিন।

গ্রন্থণা: মোহাম্মদ সিদ্দীক হায়দার

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী শব্দ

১৫৩. طَهَارَةٌ (তাহারাহ): বাংলারূপ **তহারত**। পবিত্রতা, Purity.

১৫৪. طَسْتٌ (তাসত): আঞ্চলিক বাংলা **তস্ত**। চিলমচি, Basin.

১৫৫. طَبَقٌ (তাবাক): বাংলারূপ **তবক**। সোনা/রোপার পাত, Plate.

১৫৬. طَبَقَةٌ (তাবাকাহ): আঞ্চলিক বাংলা **তবকা**। স্তর, মর্যাদা, Dignity.

১৫৭. طَاوُوْسٌ (তাউস): বাংলারূপ **তাউস**। ময়ূর, ময়ূর খচিত আসন, Peacock. যেমন- তখ্‌তে তাউস।

গ্রন্থনা: মোহাম্মদ খছরুজ্জামান



আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই

ফিলিস্তিনের পতাকা সমৃদ্ধ কাভারে আবৃত পরওয়ানা হাতে পেলাম। ফিলিস্তিনী ভাই-বোনদের জন্য মনটা খুব খারাপ। পরওয়ানা নিয়মিত ফিলিস্তিনীদের স্মরণ করছে দেখে আমি কৃতজ্ঞ। পরওয়ানার প্রতি ভালোবাসা।

নাবিল আহমদ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই,

তোমার ভালোলাগার কথা শুনে আনন্দিত হলাম। ফিলিস্তিনীদের জন্য আমাদেরও মন খারাপ। তাদের জন্য দুআ করো। পরওয়ানার সাথেই থেকো।

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: ----------

পিতা/অভিভাবক: ----------

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ---------- শ্রেণি: ----------

গ্রাম: ---------- ডাক: ----------

থানা: ---------- জেলা: ----------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আবাবীল ফৌজের নিয়মিত গল্পের পাঠক আমি। প্রত্যেক মাসের গল্প খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ি। অনেক কিছুই শিখছি। আশা করছি এই দ্বারা অব্যাহত রাখবেন। ভালোবাসা জানবেন।

মাহদি হাসান
লক্ষণাবন্দ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই

তোমার অনুভূতি জানানোর জন্য ধন্যবাদ। আমরা তোমার প্রস্তাব আমলে নিলাম। নিয়মিত পরওয়ানা পড়। এই প্রত্যাশা রইলো।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আমি পরওয়ানার নতুন পাঠক। আমাদের সিলেটে এতো সমৃদ্ধ একটি পত্রিকা আছে আগে জানতাম না। সমসাময়িক প্রবন্ধ,ছড়া-কবিতা,আবাবীল ফৌজ সব মিলিয়ে অসাধারণ। এখন থেকে নিয়মিত পরওয়ানা পড়ব। মাসের শুরুতে অপেক্ষায় থাকব।

সালমান আহমদ
লক্ষণাবন্দ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই

পরওয়ানার নতুন পাঠক হিসেবে তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। নিয়মিত পরওয়ানা পড়লে তুমি আরও অনেক কিছু জানতে পারবে । তোমার জন্য শুভকামনা।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আমি বলতো দেখি এর উত্তর দেওয়ার জন্য পুরো পরওয়ানা মনোযোগ দিয়ে পড়ি। এর ফলে, অনেক কিছুই জানতে পারি। আমার একাডেমিক পড়ার বাইরে এই পত্রিকা থেকে আমি অনেক জ্ঞান আহরণ করছি। এজন্য আমি পরওয়ানার কাছে ঋণী।

ফাহিম আহমদ
নাঙ্গলকোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুমিল্লা

-আন্দালিব ভাই

তোমার চিঠি পড়ে আনন্দিত হলাম। তুমি একজন সমৃদ্ধ পাঠক হয়ে ওঠো এই কামনা সতত। তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আবাবীল ফৌজের সদস্য হয়েছি অনেক আগে। এই বিভাগ আমি নিয়মিত পড়ি। অদ্ভুত পৃথিবী ও হাসতে জানি পড়ে আমি একইসাথে বিস্মিত হই ও আনন্দ পাই। আমিও ভবিষ্যতে আবাবীল ফৌজে লেখা পাঠাব।

জুনেদ আহমদ
চন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়, ছাতক, সুনামগঞ্জ

-আন্দালিব ভাই

তোমার উচ্ছ্বাস দেখে বেশ ভালো লাগলো। আশা করছি তুমি ধীরে ধীরে পুরো পরওয়ানা পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলবে। তোমার লেখার অপেক্ষায় রইলাম।

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি



প্রিয় বন্ধুরা!

মে মাস এলেই আমার মনটা একটুখানি ভারী হয়ে যায়। কারণ, ১৮৩১ সালের ৬ মে ইসলামের ইতিহাসের এক বীর অধ্যায় লেখা হয়েছিল। সেটা হলো—**বালাকোট**

সেদিন এক সাহসী মুজাহিদ, আমাদের প্রিয় সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.) দ্বীন ইসলামের পতাকা উঁচু রাখার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ছোট্ট একদল ঈমানদার যুবক বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল বিশাল এক শত্রু বাহিনীর সামনে। ভেবো না, শহীদ হওয়ার জন্য শুধু তরবারি লাগে। আজকের দিনে তোমার কলমও এক ধরনের তরবারি; যদি তা দিয়ে তুমি সত্য বলো, অন্যায়ের প্রতিবাদ করো, আর নিজের চরিত্রকে গড়ে তোলো এক সাহসী মুসলমান হিসেবে।

বন্ধুরা!

এই মে মাসে আসো আমরা সংকল্প করি—নামায সময়মতো আদায় করবো, আমরা মিথ্যা বলবো না, কাউকে কষ্ট দেব না, গরীব-দুঃখীর পাশে দাঁড়াবো, আর সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.) এর মতো অন্তরে জাগিয়ে তুলবো দ্বীন ইসলামের প্রেম।

ইতি

তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

বলতো দেখি?

এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. রাসূল (সা.) কাকে বিড়ালছানার পিতা বলেছেন?
২. হাদীসের আলোকে জাযীরাতুল আরব ভূমি কার জন্য নির্ধারিত?
৩. আল্লামা ইকবালের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ কী কী?
৪. মূসা (আ.) এর খাদিমের নাম কী?
৫. আযাদ কাশ্মীরের রাজধানী কোথায়?

গত সংখ্যার উত্তর

১. মুহাম্মাদ আল ইদ্রিসী
২. শাইখ ফরীদুদ্দীন আত্তার (র.)
৩. ১৩ মার্চ ২০২৫
৪. ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি
৫. আবূ আব্দিল্লাহ

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম তিনজন পুরস্কৃত]

মো:রাশেদ আলম, তাফসীরুল কোরআন দাখিল মাদরাসা, জালালপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # মোঃ- আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আব্দুল্লাহ আল হোসাইন, জালালপুর,দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # এম. সাহাব উদ্দিন, জায়ফরনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোঃ- আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # সুমাইয়া ইয়াছমিন মুন্নি, হযরত শাহখাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # সাহেরা আক্তার মুক্তা, ছাতক সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ # আব্দুস সামাদ, বাদে ভূকশিমইল, ভূকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মোঃ খলিলুর রহমান, বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদিয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা,শ্রীমঙ্গল,মৌলভীবাজার # ইয়াফিজ কবির চৌধুরী,মোহাম্মদিয়া ইসলামিয়া হাফিজয়া দাখিল মাদরাসা, টি.বি গেইট, সিলেট # আবূ সুফিয়ান সাদী, হযরত গোলাবশাহ র. হাফিযিয়া মাদরাসা, ইমামবাড়ি, বিয়ানীবাজার, সিলেট # মো. জুমান আহমদ, হযরত শাহজালাল লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # মো. আবূ সুফিয়ান সাদী, হযরত শাহজালাল লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # কাজী মোঃ জাকির হোসেন, সদরঘাট (কাজী বাড়ি), সদরঘাট, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # রেদওয়ান আলম হৃদয়, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা # কামরান হোসেন, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, শামীমাবাদ, সিলেট # সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সানি, ভানুগাছ চৌমুহনী হাফিজিয়া মাদরাসা, কেরামত নগর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # মামুন উর রশীদ, ভানুগাছ চৌমুহনী হাফিজিয়া মাদরাসা, পো:কেরামত নগর, উপজেলাঃকমলগঞ্জ, জেলাঃ মৌলভীবাজার # মোঃ তামবীর হাসান রুহান, জায়ফরনগর উচ্চ বিদ্যালয়, জুড়ী-৩২৫১, মৌলভীবাজার # হাফিজ মিজানুর রহমান, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

শব্দকল্প

১			২		৩
৪	৫		৬	৭	
৮				৯	১০
	১১			১২	

সূত্র : পাশাপাশি

১। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত মুসলিম দেশ ৪। শশধর ৬। প্রভাকর ৮। পিতা, পিতৃব্য ৯। দরজা ১১। গন্তব্য, উদ্দেশ্য ১২। নতুন।

সূত্র : উপর-নীচ

১। মালাইকা ২। জীবজন্তুর তীক্ষ্ণ নখ ৩। একটি মুসলিম নির্যাতিত শহর ৫। ঠান্ডা ৭। জ্ঞানী লোক ১০। প্রভূ এর আরবি প্রতিশব্দ।

গত সংখ্যার সমাধান

দা	দা		ত	র	ল
	ন	ক	ল		লা
ব		দ		ই	ট
ন	র	ম		জ	
সা		বু		মা	হ
ই		চি		লি	রা

গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী
মো. নাছির উদ্দিন তালহা
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

শব্দকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে (প্রথম তিনজন পুরস্কৃত)

কাজী মোঃ জাকির হোসেন, সদরঘাট (কাজী বাড়ি), সদরঘাট, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # রেদওয়ান আলম হৃদয়, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা # কামরান হোসেন, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি , শামীমাবাদ, সিলেট # সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সানি, ভানুগাছ চৌমুহনী হাফিজিয়া মাদরাসা, পো:কেরামত নগর, উপজেলাঃকমলগঞ্জ,জেলাঃ মৌলভীবাজার # মামুন উর রশীদ, ভানুগাছ চৌমুহনী হাফিজিয়া মাদরাসা, পো:কেরামত নগর, উপজেলাঃকমলগঞ্জ, জেলাঃ মৌলভীবাজার # মোঃ তামবীর হাসান রুহান, জায়ফরনগর উচ্চ বিদ্যালয়, জুড়ী-৩২৫১, মৌলভীবাজার # হাফিজ মিজানুর রহমান, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # এম.সাহাব উদ্দিন, জায়ফরনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোঃ- আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # সুমাইয়া ইয়াছমিন মুন্নি, হযরত শাহখাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # সাহেরা আক্তার মুক্তা, ছাতক সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ # আব্দুস সামাদ, বাদে ভূকশিমইল, ভূকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মোঃ খলিলুর রহমান, বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদিয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা,শ্রীমঙ্গল,মৌলভীবাজার # ইয়াফিজ কবির চৌধুরী,মোহাম্মদিয়া ইসলামিয়া হাফিজয়া দাখিল মাদরাসা,টি.বি গেইট, সিলেট # আবূ সুফিয়ান সাদী, হযরত গোলাবশাহ র. হাফিযিয়া মাদরাসা, ইমামবাড়ি, বিয়ানীবাজার, সিলেট # মো:রাশেদ আলম, তাফসীরুল কোরআন দাখিল মাদরাসা, জালালপুর,দক্ষিণ সুরমা,সিলেট # এম.সাহাব উদ্দিন, জায়ফরনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার।

বর্ণকল্প

এ সংখ্যার বর্ণকল্প

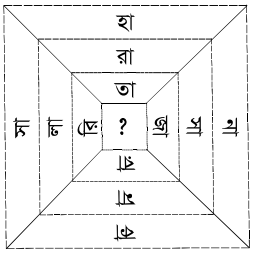

বর্ণগুলো এলোমেলো আছে। এগুলো সাজিয়ে কেন্দ্রের ফাঁকা ঘরে একটি মাত্র বর্ণ বসালে চারটি অর্থবোধক শব্দ তৈরি হবে। চেষ্টা করে দেখতো অর্থসহ শব্দ চারটি তৈরি করতে পারো কি না! সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।

গত সংখ্যার সমাধান

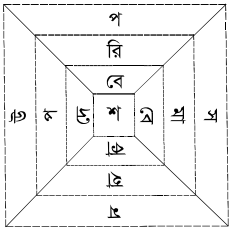

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের পরিকল্পনাকারী
আজিম উদ্দিন মাছুম
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

কাজী মোঃ জাকির হোসেন, সদরঘাট (কাজী বাড়ি), সদরঘাট, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # রেদওয়ান আলম হৃদয়, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা # কামরান হোসেন, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি , শামীমাবাদ, সিলেট # সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সানি, ভানুগাছ চৌমুহনী হাফিজিয়া মাদরাসা, পো: কেরামত নগর, উপজেলাঃ কমলগঞ্জ, জেলাঃ মৌলভীবাজার # মামুন উর রশীদ, ভানুগাছ চৌমুহনী হাফিজিয়া মাদরাসা, পো: কেরামত নগর, উপজেলাঃ কমলগঞ্জ, জেলাঃ মৌলভীবাজার # মোঃ তামবীর হাসান রুহান, জায়ফরনগর উচ্চ বিদ্যালয়, জুড়ী-৩২৫১, মৌলভীবাজার # হাফিজ মিজানুর রহমান, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # রুহুল ইসলাম তুন্না, সাংগঠনিক সম্পাদক, জালালপুর ইউনিয়ন তালামীয, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # এম.সাহাব উদ্দিন, জায়ফরনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোঃ- আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # সুমাইয়া ইয়াছমিন মুন্নি, হযরত শাহখাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # সাহেরা আক্তার মুক্তা, ছাতক সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ # আব্দুস সামাদ, বাদে ভূকশিমইল, ভূকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মোঃ খলিলুর রহমান, বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদিয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার # ইয়াফিজ কবির চৌধুরী, মোহাম্মদিয়া ইসলামিয়া হাফিজয়া দাখিল মাদরাসা,টি.বি গেইট, সিলেট # আবূ সুফিয়ান সাদী, হযরত গোলাবশাহ র. হাফিযিয়া মাদরাসা, ইমামবাড়ি, বিয়ানীবাজার, সিলেট # এম.সাহাব উদ্দিন, জায়ফরনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোঃ আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট।

অদ্ভুত পৃথিবী

পয়েন্ট নিমো



পৃথিবীতে এমন একটি রহস্যময় জায়গা আছে যেখানে চারিদিকে নীরবতা বিরাজ করছে। হাজার হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত মানুষের কোনো চিহ্ন নেই। রহস্যময় এই জায়গাটির নাম পয়েন্ট নিমো। আজ পর্যন্ত এই জায়গায় কেউ পৌঁছাতে পারেনি। পয়েন্ট নিমো হলো প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানের একটি স্থানের নাম। এই দক্ষিণ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে বিদ্যমান,তবে এটি কোনো দেশের মধ্যেই পড়ে না। সেখানে নেই কোনো প্রাণী বা গাছপালা। তবে রহস্যময় এই স্থান থেকে শোনা যায় ভয়ংকর সব শব্দ। পয়েন্ট নিমো আনুষ্ঠানিকভাবে 'অগম্যতার সমুদ্রের মেরু' বা ভূমি থেকে সবচেয়ে দূরে সমুদ্রের বিন্দু হিসেবে পরিচিত। ৪৮°৫২.৬'এস ১২৩°২৩.৬'ডাব্লিউ'তে অবস্থিত, স্পটটি আক্ষরিক অর্থে সমুদ্রের অনেকটা মাঝামাঝিতে অবস্থিত,যারা প্রতিটি দিকে ১০০০ মাইলেরও বেশি সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। মেরুর সবচেয়ে কাছের ল্যান্ডমাসগুলো হলো উত্তরে পিটকেয়ার দ্বীপপুঞ্জের একটি,উত্তর-পূর্বে ইস্টার দ্বীপপুঞ্জের একটি ও দক্ষিণে অ্যান্টার্কটিকার উপকূলের একটি দ্বীপ। পয়েন্ট নিমোর কাছাকাছি কোথাও কোনো মানুষের বসবাস নেই। এ কারণেই বিজ্ঞানীরা স্থানটির নাম ল্যাটিন ভাষায় 'নিমো' রাখেন,যার অর্থ 'কেউ না'। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকা নভোচারীরা যে কোনো সময় পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৫৮ মাইল দূরে থাকে।

হাসতে জানি

এক স্কুলশিক্ষক স্কুলের বাইরে বসেছিলেন। এমন সময় তার সামনে কাঁচুমাচু হয়ে একটি ছেলে এসে জানালো,সে নদীতে কুলি ফেলেছে এবং এর জন্য সে ক্ষমা ও উপদেশ চায়। স্কুলশিক্ষক বললেন,এ আর এমন কি? হয়তো নদীর পানি সামান্য ময়লা হতে পারে কিন্তু এর জন্য ক্ষমা চাওয়া জরুরি নয়। কিন্তু ছেলেটি নাছোড়বান্দা। অবশেষে শিক্ষক তাকে দুটো উপদেশ দিয়ে বিদায় করলেন ।
কিছুক্ষণ পর আরেকটি ছেলে এসে নদীতে কুলি ফেলার জন্য ক্ষমা ও উপদেশ চেয়ে গেল। তারপর আরেকজন। স্কুলশিক্ষক বেশ অবাক হলেন। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে একজন প্রবেশ করল। স্কুলশিক্ষক বললেন,তুমিও কি নদীতে কুলি ফেলে ক্ষমা ও উপদেশ চাইতে এসেছ? সে রাগে চিৎকার করে বললো,রাখুন আপনার উপদেশ। আমিই কুলি! পাশের রেল স্টেশনে কাজ করি। তিন বদমাশ ছেলে ধাক্কা আমাকে দিয়ে নদীতে ফেলে দিয়েছে। তাদের এদিকে আসতে দেখলাম মনে হয়।

সংগ্রহে: নাঈম আহমদ, আল জান্নাত ইসলামিক এডুকেশন ইনস্টিটিউট

আবাবীল ফৌজের সদস্য হলো যারা

৩৫৩৩. নাঈম আহমদ
পিতা: মো. আপ্তাব মিয়া
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: আল জান্নাত ইসলামিক এডুকেশন ইনস্টিটিউট
গ্রাম: পাঠকুড়া
ডাক: মন্ডলীভোগ
থানা: জগন্নাথপুর
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৫৩৪. কাওছার আহমদ
পিতা: আব্দুল কাইয়ূম
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: সফির উদ্দিন হাই স্কুল এন্ড কলেজ
গ্রাম: মাধবপুর
ডাক: কালারুকা
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৫৩৫. মারজান তালহা
পিতা: আব্দুল বাছিত
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: রাখালগঞ্জ ফাযিল মাদরাসা
গ্রাম: ইলাইগঞ্জ (সুড়িগাঁও)
ডাক: ইলাইগঞ্জ
থানা: মোগলাবাজার
জেলা: সিলেট

৩৫৩৬. টি এন তামিম
পিতা: আব্দুল মুকীত
প্রতিষ্ঠান: সন্দলপুর ভারতচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: হরিপুর
ডাক: খাগাউড়া
থানা: বানিয়চং
জেলা: হবিগঞ্জ

৩৫৩৭. রাহিম আহমদ
পিতা: মো. নানু মিয়া
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: এল.বি গ্রীণ ফ্লাওয়ার একাডেমি
গ্রাম: লক্ষণাবন্দ
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩৫৩৮. জুনেদ মাহি
পিতা: মো. বকুল মিয়া
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: লক্ষণাবন্দ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: লক্ষণাবন্দ
ডাক: চৌধুরীবাজার
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩৫৩৯. মাহবুবা জান্নাত
পিতা: মাছুম আহমদ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: কুলাউড়া দারুসসুন্নাহ মডেল মাদরাসা
গ্রাম: ইটাখলা
ডাক: বরমচাল
থানা: কুলাউড়া
জেলা: মৌলভীবাজার

৩৫৪০. মরিয়ম বেগম সুইটি
পিতা: শফিকুর রহমান
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: রাধানগর মোহাম্মদিয়া দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: রাধানগর
ডাক: গোবিন্দগঞ্জ
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৫৪১. ফয়েজ আহমদ সাব্বির
পিতা: মাওলানা ওয়ারিছ উদ্দিন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ব্লু-বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ
গ্রাম: ইটাখলা
ডাক: ছাতক, খারগাঁও
থানা: কালারুকা
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৫৪২. মো. রেদওয়ানুল হক সোহাগ
পিতা: মো. আলা উদ্দিন
গ্রাম: শষ্যউড়া, রাজীবাড়ি
ডাক: কামালবাজার
থানা: দক্ষিণ সুরমা
জেলা: সিলেট



প্রস্তাবিত ভবন

- মসজিদ
- হিফযুল কুরআন
- প্রকাশনা
- অফিস
- ভাষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- মাদরাসা
- ইয়াতীমখানা
- খানকাহ
- দাওয়াহ সেন্টার
- মেহমানখানা
- দারুল কিরাত
- গ্রন্থাগার
- স্টাডি সার্কেল
- মিলনায়তন
- তাখাস্সুস (হাদীস ও ফিক্হ)

مركز الفولتالى داكا

FULTOLI COMPLEX DHAKA

Khilgaon, Dhaka, Bangladesh

কেশব্দর

প্র কা শ নী

দারুল হিকমাহ একাডেমি কমলগন্জ

- মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভর্তি
- ইসলামি ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে প্রণীত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষাদান
- সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষাদান, নিয়মিত মডেল টেস্ট
- কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ
- নিরিবিলি পরিবেশে শিক্ষাদান
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী দ্বারা শিক্ষাদান
- গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন মুক্ত ক্লাসের পড়া ক্লাসেই হাতে কলমে শেখানো ব্যবস্থা
- ইংরেজি ও আরবি স্পোকেন এর ব্যবস্থা
- নিয়মিত আখলাকী তা'লীম প্রদান
- সনদপ্রাপ্ত ক্বারীগণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ প্রশিক্ষণ
- শিক্ষার মানোন্নয়নে ত্রি-পক্ষীয় (শিক্ষক-অভিভাবক- পরিচালনা পরিষদ) বৈঠক
- রুটিনভিত্তিক সু-শৃংখল পাঠদান ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা
- ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা, বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, শিক্ষা সফর ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সুযোগ
- সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার
- গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

প্লে শ্রেণি থেকে স্ট্যান্ডার্ড ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত

নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : মো. আতিকুর রহমান সাকের

সীমিত আসন

স্বল্প বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ

ক্যাম্পাস | আলেপুর (আদমপুর রোড, চেকপোস্ট-এর দক্ষিণ পার্শ্বে) কমলগন্জ, মৌলভীবাজার।

যোগাযোগ: ০১৭১২-৬৮৬২৮২, ০১৭১২-৭৬৭২৮৪

আপনি কি ২০২৬, ২০২৫, ২০২৭ সালের মধ্যে

হজ্জ করতে চান?

মাত্র ৩১,০০০ টাকা জমা দিয়ে আজই প্রাক নিবন্ধন করুন

ওমরাহ স্পেশাল প্যাকেজ

"আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিনা তবে আমরা ব্যতিক্রম"

স্বত্বাধিকারী

আলহাজ্জ মাওলানা খাজা মঈনউদ্দীন আহমদ জালালাবাদী

+88 01711 838 624

জালালাবাদ হজ্জ কাফেলা

Khaja Air Liner

খাজা

Khaja

air Liner

Travel & Tours

হজ্জ ওমরাহ গ্রুপ

আন্তর্জাতিক এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট এন্ড টুরস

Govt. Licn. No :253, 511, 882

IATA ACCREDITED AGENT

Biman BANGLADESH AIRLINES APPROVED

TURKISH AIRLINES

BRITISH AIRWAYS

Emirates

QATAR

SINGAPORE AIRLINES

US-BANGLA AIRLINES

REGENT

NOVOAIR

আমাদের নিজস্ব স্টক হতে সর্বনিম্ন মূল্যে বিশ্বের যে কোন গন্তব্যের বিমান টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

সিলেট অফিস

সবুজ বিপনী (৩য় তলা) জিন্দাবাজার

01724 926 329, 01714 486796

www.khajaairliner.com

ঢাকা অফিস

হোটেল বকসি (২য় তলা). ফকিরাপুল

01724 691 177, 0248 313524

khajaairliner@yahoo.com

লতিফিয়া হিফযুল কুরআন একাডেমি ওসমানীনগর

LATIFIA HIFZUL QURAN ACADEMY OSMANINAGAR

(একটি অত্যাধুনিক মানসম্পন্ন আবাসিক হাফিজিয়া মাদরাসা)

বৈশিষ্ঠাবলী

- সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থাপনা
- সুন্নতে নববীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধান
- কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক
- প্রবাসী ও দুরবর্তী ছাত্রদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ
- ছাত্রদের খেলাধূলা ও শরীরচর্চার সুযোগ-সুবিধা
- বোর্ড পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনের নিশ্চয়তা
- সর্বোচ্চ তিন বছরে হিফজ সম্পন্ন করার নিশ্চয়তা (ইনশা আল্লাহ)
- একাধিক ক্লাস টেস্ট ও বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট গ্রহণ
- পাঁচ বছরে দাওরাসহ ইবি, জে.ডি.সি ও দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ ও বিজ্ঞান শাখায় পাঠদানের ব্যবস্থা
- প্রতিভা বিকাশের লক্ষে সাপ্তাহিক সেমিনার, সবিনা, বিতর্ক অনুষ্ঠান ও দেয়ালিকা প্রকাশ



সফলতার ১ যুগ

ভর্তি চলছে

প্রতিবছর

- ১লা ডিসেম্বর থেকে ভর্তি শুরু
- ২রা জানুয়ারি মেধা যাচাই পরীক্ষা
- নতুন ভর্তিকৃত ছাত্রদের ৫ জানুয়ারি হোস্টেলে আগমন
- ১লা জানুয়ারি থেকে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু

বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ সফলতা

ক্যাম্পাস | দক্ষিণ তাজপুর, ওসমানীনগর, সিলেট

যোগাযোগ

মাওলানা এম.এ রব প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও প্রিন্সিপাল

মশাহিদুর রহমান প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক

০১৭১৬-৯৩৯৯১৮, অফিস: ০১৭৮৫-১২৮১২৮

E-mail: moshahidurrahman@yamail.com

LATIFI HANDS

FULTALI SAHEB BARI, ZAKIGANJ, SYLHET, BANGLADESH

OUR PROJECTS

EDUCATION
ORPHANS
HOUSING PROJECTS
MASJID PROJECTS
INFRASTRUCTURE
SUSTAINABLE LIVELIHOODS
AGRICULTURE SUPPORT
WEEDING SUPPORT
SADAQAH PROJECT

HEALTH CARE
EYE CARE
GIFT
QURBANI PROJECT
EMERGENCY AND DISASTER RELIEF
BLIND AND DISABLED PROJECT
WATER PROJECT
WIDOW SUPPORT

www.youtube.com/latifihands
www.facebook.com/latifihands

www.latifihands.org.uk

মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ও দরসে নিজামির সমন্বিত সিলেবাসে

দাখিল নবম শ্রেণিতে

ভর্তি চলছে

সীমিত আসন

আমরা ভিন্ন কেন?

- আলিম ও দরসে নিজামির সমন্বিত সিলেবাস।
- সম্পূর্ণ আবাসিক ও সার্বক্ষণিক তদারকি।
- ইলম অর্জনের পাশাপাশি আমলে অভ্যস্ত করণের পরিবেশ।
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য সুবিধা গ্রহণের সুযোগ।

যোগাযোগ

01700-842680, 01339-380333
01712-904501, 01737-769053

হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ

কলেজ রোড, কদমতলী, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

লতিফ ট্রাভেলস

লতিফ হলিডেইজ

IATA ATAB TOAB TDAB

প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের ৬৩ লতিফ ট্রাভেলস ইসিস : ১৯৬২

হজ্জ লাইসেন্স নং-২৪৯ | ওমরা লাইসেন্স নং-৩১২

হজ্জ & ওমরা এজেন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
হজ্জ নীতিমালা অনুযায়ী (ক্রমিক নং অনুযায়ী হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করা হবে) পরবর্তী হজ্জের জন্য
হজ্জ রেজিস্ট্রেশন চলছে হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করতে আপনার
নিকটবর্তী আমাদের যেকোন শাখায় রেজিস্ট্রেশনের আজই যোগাযোগ করুন -

- এয়ার টিকেট
- প্যাকেজ ট্যুর
- ম্যানপাওয়ার
- ভিসা প্রসেসিং

হযরত শাহজালাল রোড। দরগা গেইট
হোটেল হলি ইনের পার্শ্বে। সিলেট।
০১৯৭৩৩৩০৭২৯। ০১৩১৮২১০০৭৩

১১৯-১২৪ আর.বি কমপ্লেক্স
(নীচ তলা) । পূর্ব জিন্দাবাজার । সিলেট
০৮২১-৭১৪৩২২ ০১৭১১ ৩৩০ ৭২৯
latiftravels1962@gmail.com

ষ্টেশন রোড। ভার্থখলা। সিলেট
০৮২১-৭১৭৪৩৭। ৭১৪৪৭৬। ৭১৫২৪৩
০১৭১১ ০০৬ ১০৫। ০১৮৪৬ ৩৯০ ৭৮৪
latiftravels@hotmail.com

১০৪-১০৯ রোজ ভিউ কমপ্লেক্স
(নীচতলা)। শাহজালাল উপশহর। সিলেট
০৮২১ ৭২৪০০৭ ০১৭১১ ৩২২৪৪৪
latiftravels@gmail.com

বিয়ানীবাজার : হাজী সিরাজ ভবন, ২য় তলা কলেজ রোড, বিয়ানীবাজার। ০১৭৭১ ১৪৪ ৬৬৬
বড়লেখা : হাবীব মার্কেট (২য় তলা), পূবালী ব্যাংক সংলগ্ন, বড়লেখা। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫০
মৌলভীবাজার : কুসুমবাগ শপিং সিটি (নীচতলা), কুসুমবাগ, মৌলভীবাজার। ০১৭১২ ৬৮৭ ৮৭১
শমশের নগর : এম কে রহমান ট্রেড সেন্টার, ষ্টেশন রোড, শমশের নগর। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫৫
ঢাকা কর্পোরেট : হক চেম্বার, (৫ম তলা), দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা। ০১৯১২ ৫৭৭ ৪২৩

বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে টিকেটের সঠিক মূল্য জানুন,
ঘরে বসে নিজের টিকেট নিজেই বুকিং করুন - লতিফ ট্রাভেলস পোর্টালের মাধ্যমে
Ticketing Portal : www.latiftravels.net

latiftravels.com.bd latiftravels.com @Latiftravelsroseview

লতিফিয়া টেইলার্স

এন্ড এম্ব্রয়ডারী

লেডিস এন্ড জেন্টস

তৈরি পোশাকে একধাপ এগিয়ে

এখানে জুব্বা, পায়জামা এবং পাঞ্জাবী আধুনিক ও মানসম্পন্ন এম্ব্রয়ডারি ডিজাইনে দক্ষ কারিগর দ্বারা তৈরি করা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য
মাদরাসা ও স্কুল ড্রেস তৈরি করা হয়

মাওলানা মো. নাজমুল হুদা
মোহাম্মদ যুহায়ের আহমদ
০১৭৮৫-০৫৩৬০৬
০১৫৭৬-৫০৭৩৮৮

দোকান নং-৪, সোবহানীঘাট কামিল মাদরাসা মার্কেট, সোবহানীঘাট, সিলেট

বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা
সর্বোচ্চ মান নিয়ে আমরা আছি আপনার পাশে



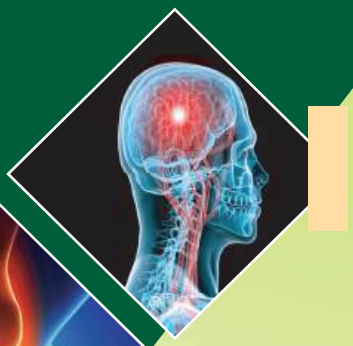





- আই.সি.ইউ
- এন.আই.সি.ইউ
- পি.আই.সি.ইউ
- পি. এইচ. ডি. ইউ
- সি.সি.ইউ, এইচডিইউ
- ডেন্টাল কেয়ার
- জেনারেল সার্জারী
- ডায়ালাইসিস ইউনিট
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা
- ২৪ ঘন্টা ফার্মেসী বিভাগ
- ২৪ ঘন্টা জরুরী বিভাগ
- মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার
- ২৪/৭ ডায়াগনস্টিক সার্ভিস
- আই.সি.ইউ এম্বুলেন্স সার্ভিস
- ইনফার্টিলিটি (বন্ধ্যাত্ব) কেয়ার।

ওয়েসিস হসপিটাল

সোবহানীঘাট, সিলেট

Subhanighat, Sylhet

E-mail: oasishospitals@gmail.com, info@oasishospitalbd.com, Cell: 01611-990000, 01763-990055

Al ISLAH
CASH & CARRY



CASH & CARRY AND WHOLESALE
OPEN TO THE PUBLIC
CATERERS ONESTOP SHOP
LARGE PARKING

WE SPECIALIZE IN FULL CATERING SUPPLIES
WE SPECIALIZE FOR YOUR FULL PACKAGING SUPPLIES
RICE, FLOUR, SPICES, TIN PRODUCT, PAULTRY, LAMB, MUTTON

290-294, BISCOT ROAD
LUTON, LU3 1AZ

01582 414154
07769 778127